নিবেদন

পাঠক-পাঠিকাদের নিজস্ব ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা।
মানবজীবনে চলার পথে সঞ্চিত নানান জীবন অভিজ্ঞতার কুসুমকলিকে
প্রস্ফুটিত করার আমাদের এ এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

□ সম্পাদকমণ্ডলী □

সভাপতি □

অধ্যাপক ড. গৌতম ভট্টাচার্য

প্রধান উপদেষ্টা □

শ্রী অপূর্ব কর্মকার, শ্রী অসীমবন্ধু খাঁড়া

সদস্যবৃন্দ □

ডা. বিপদতারন দাস, ড. অনিন্দ্যবন্ধু গুহ, শ্রী কল্যাণ কুমার সুর,
শ্রী অসিত পালিত, শ্রীমতী সুস্মিতা ত্রিপাঠী (ব্যানার্জী), শ্রীমতী তৃপ্তি রায়,
ড. অমলেন্দু হাজরা, শ্রী অভিজিৎ লাহিড়ী, শ্রীমতী চম্পা পাল

প্রকাশনা উপদেষ্টা □

জয়ন্ত সুকুল

প্রচ্ছদ অলংকরণ □

রমেন্দু মিত্র

প্রচার সহায়ক □

সমর প্রামাণিক

সম্পাদক □

শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

সম্পাদকীয়

মানবসমাজ-এর অস্তিত্বভূমি এই পৃথিবীর ওপর দিয়ে প্রবাহিত ভয়াবহ অতিমারি করোনার গ্রাসে আমরা হারিয়েছি অসংখ্য মূল্যবান প্রাণ। কাজ, পেশা, ব্যাবসা হারিয়ে ধ্বস্ত হয়েছে অসংখ্য মানুষ। শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলাসহ সমস্ত নান্দনিক ক্ষেত্রে এসেছিল ঘোর অমানিশা। সমগ্র মানবজাতির সংঘবদ্ধ, প্রতিস্পর্ধী প্রতিরোধে বেঁচে থাকার প্রত্যয়ে সব বাধা কাটিয়ে পৃথিবী ধীরে ধীরে ফিরে এসেছে চিরাচরিত আপন ছন্দে। সেই ছন্দের রেশ ধরে আমাদের সৃষ্টিশীলতার ক্ষুদ্র প্রয়াস সাহিত্য পত্রিকা 'নিবেদন' ধীরে ধীরে দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করল। বর্তমান সংক্ষুব্ধ সময়েও পত্রিকার সমস্ত পাঠককুল ও শুভানুধ্যায়ীদের অকুণ্ঠ শুভকামনা, অনুপ্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতায় আমাদের পত্রিকার লেখক-লেখিকাদের সাহিত্যসাধনার কিছু রম্য আলেখ্য প্রকাশ করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছি আমরা, 'নিবেদন'-এর মাধ্যমে। আপনারা সবসময় আমাদের এই সৃজনমূলক সাহিত্যসাধনার উদ্যোগের পাশে আছেন দ্বিতীয় বর্ষে এই সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে তা আবার প্রমাণিত হল। আমরা স্থির প্রত্যয়ী যে, 'নিবেদন'-এর আগামী সংখ্যা প্রকাশেও সুধী সাহিত্যপ্রেমী পাঠক-পাঠিকাদের একই-রকম অনুপ্রেরণা ও আন্তরিক সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হব না।

পরিশেষে, আরও একবার সুধী পাঠককুল, বিজ্ঞাপনদাতাগণ এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকলকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাংস্কৃতিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

সম্পাদক
শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

'নিবেদন'-এর সার্বিক যোগাযোগের ঠিকানা □

শ্রী সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

৭০/১১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলকাতা-৭০০০৩৪

দূরভাষ ঃ ৯০৫১১ ৯২১৮০ (হোয়াটসঅ্যাপ)

শ্রী অপূর্ব কর্মকার

৭০বি/১, বামাচরণ রায় রোড, বেহালা, কলকাতা- ৭০০০৩৪

দূরভাষ □ ৮৯৮১০ ২১৯৫৬ (হোয়াটসঅ্যাপ)

বি.দ্র. 'নিবেদন'-এর জন্য যে-লেখাগুলি পাঠাবেন তা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বানান বিধি অনুসৃত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

লেখা পাঠান ওপরের Whatsapp ও e-mail : iapurbakarmakar@gmail.com-এর মাধ্যমে। Unicode বাঞ্ছনীয়, PDF নয়, Word File পাঠান, সঙ্গে ঠিকানা এবং ফোন নম্বর অনুগ্রহ করে অবশ্যই জানাবেন।

সূচিপত্র

বিভাগ	বিষয়/শিরোনাম	লেখক	পৃষ্ঠা
কবিতা	প্রাণের সখা - দুঃখ সখা	প্রভাতী ভট্টাচার্য্য	৫
	ব্যবচ্ছিন্ন সম্পর্ক	,,	৫
	সময়ের সাথে	অমিতাভ কুণ্ডু	৬
	দেখা হবে	তুষাণ হালদার	৬
	ইতিকথা	চম্পা বিশ্বাস	৬
	নীরা, তুমি বাঁচো	তপন আইন	৭
	মেঘ সাথী	সুস্মিতা ত্রিপাঠী ব্যানার্জী	৭
	মেরুদণ্ড	শুভশ্রী সরকার	৮
	তোমায় হৃদমাঝারে রাখব	স্বনাম গুপ্ত	৮
	ক্ষুধা	ডাঃ বিপদতারন দাস	৯
	চিত্র-বিচিত্র	,,	৯
	ভালোবাসা	কল্যাণ কুমার সুর	৯
	সংখ্যা-তত্ত্ব	চিরপ্রশান্ত বাগচী	১০
	ভাঙন	শুভদীপ সরকার	১০
	পারিজাত মালা হাতে	প্রজ্ঞাপারমিতা মণ্ডল	১১
	অস্তিত্বের আদিম ইঙ্গিত	দীপঙ্কর মজুমদার	১১
	ভিন্ন ধারা	প্রতীপ মুখোপাধ্যায়	১২
	শাসক ও শাসিত	সুকুমার মণ্ডল	১২
	মৃত্যু-খেলা	জয়ন্ত সুকুল	১৩
	ইচ্ছে-স্বপ্ন	,,	১৩
	হারিয়ে গেছে	স্নিগ্ধা পাল	১৪
	তবুও মানুষ	মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল	১৪
	প্রেম	নিরাশাহরণ নস্কর	১৫
	কুকুর ছানা	প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস	১৫
	বর্ষা	আরতি ভট্টাচার্য্য	১৬
	নীড়	মঞ্জুশ্রী রঙ্গা	১৬
ছোটো গল্প	পাঁঠারসিক পরশবাবু	ড. গৌতম ভট্টাচার্য্য	১৭
	বাঁশফুল	অপূর্ব কর্মকার	২০
	জিজীবিষু	নীতা মণ্ডল	২২
	মাস্টারমশাই	মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ	২৬
	অন্য অনুভূতি	দিপালী বৈদ্য	২৮
	যুদ্ধ	শ্রাবণী চক্রবর্তী	২৯
	লোভী	সমরকৃষ্ণ মণ্ডল	৩২
	ভালোবাসার শহরে	অপূর্ব মিত্র	৩৬
ভ্রমণ কাহিনি	গুজরাট ভ্রমণ	চয়নকান্তি দাস	৩৮
বিশেষ রচনা	অস্তিত্ববাদ ও জাঁ পল সার্ত্র	ড. অমলেন্দু হাজরা	৪১
প্রবন্ধ	বাংলা ক্যালেণ্ডার ১ তারিখ	ভারত পণ্ডিত	৪৫
	সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্নীতি প্রসংগ একটি সময়ানুগ পর্যবেক্ষণ	ড. দেবদাস মণ্ডল	৪৭

কবিতা

দুটি কবিতা
প্রভাতী ভট্টাচার্য্য

প্রাণের সখা-দুঃখ সখা

সুখের ঘরে চাবি দিয়ে কোথায় তুমি গেলে?
দুঃখগুলো আমার জন্য রেখে গেছ ফেলে?
কত-না দিন কেটে গেল কত বছর পার
অন্তবিহীন অপেক্ষাতে জীবন অন্ধকার।
আসবে কবে খুলবে তালা মুক্তি পাবে সুখ,
দুঃখগুলোই আপনতর নিত্য জাগরুক।
স্পর্শকাতর কোমল প্রাণে দুঃখে বীণা বাজে,
অনুভবের রাগরাগিণীর আলাপ হৃদি মাঝে।
আঘাত যত জীবন জুড়ে নকশা ওরা বোনে
ফুল ফোটাতে ওরাই পারে লুকিয়ে ব্যথা মনে।
সাজিয়ে রাখা ঘরের বাঁধন কাটিয়ে নামায় পথে
মিথ্যা মোহের ঘোর ভাঙিয়ে ডাকে অজানিতে।
মন-পাখিটার বিক্ষত প্রাণ শোণিত ধারা বুকে,
তবুও তো সে গান গেয়ে যায় জানি না কোন্ সুখে।
দুঃখ ব্যথা আঘাত নিয়ে দিনযাপনের খেলা,
সুখের কথা গেছি ভুলে থাকুক ঘরে তালা।
জানি তুমি আসবে না আর ফিরবে না এই পথে
অবাঞ্ছিত আজকে তুমি আমার জীবনস্রোতে।
জড়ো করা দুঃখগুলো আমার রত্নমালা,
ওরাই আমার উদাসী সুর বাউল আপনভোলা।

ব্যবচ্ছিন্ন সম্পর্ক

বরফ ঢাকা পাহাড় চুড়োর মতো
সম্পর্কে বরফ পড়ে যদি,
সে বরফ কি গলবে কোনোদিনও
মুক্তি পাবে বন্দি থাকা নদী।
সাগরতলে নরম পলি জমে
একদিন তাও কঠিন পাথর হয়ে,
জীবনটা তো আঘাত-প্রত্যাঘাতে
আপন স্বরূপ আপনি করে ক্ষয়।
মনের তলে ফল্গু বয়ে চলে
বাইরে ঢাকা বালির আস্তরণ
পুরু বালির স্তরের নীচে চাপা
করবে কে সেই নদীর অন্বেষণ?
অগম্য ওই অরণ্যেরই মতো
কাছের মানুষ দূরেই থাকে সরে
দূরত্বটা প্রতিক্ষণে ক্ষণে
লক্ষ যোজন কোটি যোজন বাড়ে।
পাশাপাশি সমান্তরাল পথ
আর মেশে না একটি বিন্দু হয়ে
দুটি পথের দূরত্বটা বাড়ে
অঙ্কটা শেষ বিয়োগে পা দিয়ে।
সহাবস্থান চলতে থাকে তবু
বহিরঙ্গে আপস অভিনয়
এমনি করে সাজিয়ে নাট্যশালা
সারাজীবন নিত্য পাপক্ষয়।

(বেহালা, কলকাতা)

সময়ের সাথে
অমিতাভ কুণ্ডু

পাখির ডানায় চড়ে ভেসে চলে সময়,
অবাধ যাতায়াত তার অমর অজেয়,
নির্দয় তুমি করে দাও ছারখার বারংবার,
মানুষের ছোটো ছোটো আশায় দাও সজীবতা।

চারদিকের হতাশার মাঝে আছ গর্বভরে,
তাকাও না ফিরে নগণ্য মানুষের দিকে,
বয়ে যাও নির্বিকার আবহমান কাল ধরে
নৈরাশ্যে হয় ভরপুর মলিন চরাচর।

সুখ-দুখের চয়ন মালায় ভরিয়ে দাও
মানুষের পরাজিত দুর্বল দুটি হাত
পারো না ফিরিয়ে দিতে আমাদের শৈশব
হয়ে থাকো সদা রহস্যময় নীরব।
তবুও তোমার সাথী হয়েই করতে হবে জয়।

(দমদম, কলকাতা-২৮)

ইতিকথা
চম্পা বিশ্বাস

আমরা এখনও বেঁচে আছি—
করোনা কলিঙ্গ কুরুক্ষেত্রের শেষে।
হাজার লক্ষ কোটি মানবপ্রাণ হারায়,
তবু সংগ্রাম শেষে ক্লান্ত পথে শ্রান্ত সেনা রয়ে যায়
পরিজনের ব্যথায় যুদ্ধ জয়ের গরিমা থাকে না সেথায়
মানুষই সবথেকে বড়ো জীবন্ত ইতিহাস।
যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে ইতিকথা করে ফিসফাস।
হাসি-কান্না ব্যথা-বেদনা—
জেগে থাকা এক চেতনা।
প্রবহমানতায় বয়ে আনা জীবন্ত জীবাশ্ম ঘটনা।

(ঠাকুরপুকুর, কলকাতা)

দেখা হবে
তুষান হালদার

জীবন সফরে
ব্যস্ত শহরের হাজার লোকের ভিড়ে
কেই-বা সঠিক মানুষ চিনতে পারে
মুখোশগুলো ঝকমকে জীবাশ্ম, ছাপ থেকে যায় মনের দুয়ারে
ভালোমন্দের হিসেবনিকেশ দাঁড়ি পাল্লায় যদি কেউ করে
কার ভার কত বেশি, কেই-বা উঁচু মিনারে
যত আছে রক্ত, নিথর রাজনীতি ভক্ত, শিরদাঁড়ায় শক্ত সবই প্রথম
পাতার খবরে।
তাই তো পা ফেলেছি ভয়ে ভয়েই,
সভ্যতা দেখছে সবই, শুনছে সবই
নিখোঁজ নদীর গতিপথের মোহানায় যদি হয় হঠাৎ নৌকাডুবি
সময়-খাতে, কাকে পাব সাথে কেই-বা জানি
এ পৃথিবীর নীল নীলিমায় আবার আসিব ফিরি
গোধূলি আলাপে, গলিত লালাভ ঢেউয়ের স্পর্শে
বালিয়াড়ির হলদে নোনা উষ্ণতায় আঁকব তোমার জলছবি
জানি প্রেমের বাঁধনে আবার বাঁধিবি।
সেই অপেক্ষাতেই,
তবে সময় কথা বলবে, কথা বলবেই
আবার দেখা হবে, দেখা হবেই।

(কলকাতা-৩৪)

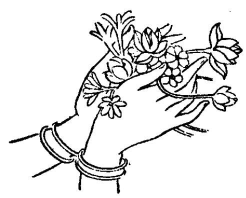

নীরা, তুমি বাঁচো
তপন আইন

কার্তিকের রৌদ্রদগ্ধ দুপুরে ছুটে যাচ্ছে নীরা
সুনীলের শবযাত্রার পেছনে। তার আয়ত চোখ দিয়ে
ক্রমাগত বয়ে যাচ্ছে অশ্রুধারা। মাঝে মাঝে চিৎকার করে
বলছে, 'সুনীল, সুনীল, আমাকে কোথায় রেখে যাচ্ছ?'
সুনীলের মুখে যেন স্মিত হাসি, অনায়াস উত্তর —
'পৃথিবীতে একা এসেছি, একাই তো যেতে হবে নীরা,
সহমরণ এখন পাপ, তুমি এখানেই থাকবে, ভয় কী?
আমি কবিতার জন্য অমরত্ব প্রত্যাখ্যান করেছি, কিন্তু
তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি অমরত্ব, তুমি থাকো নীরা, তুমি থাকো।'
ভূলুণ্ঠিত নীরা চেয়ে রইল সুনীলের দিকে,
সুনীল হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে অগ্নিরথে, আর
বার বার উচ্চারণ করছে সেই পঙ্‌ক্তি,
'এই হাত ছুঁয়েছে নীরার মুখ ...'
নীরা তার মেঘের মতো চুল ঝাঁকিয়ে চিৎকার করে বলল,
'আমি অমরত্ব চাই না সুনীল, আমি শুধু তোমাকে চাই।'
সুনীলের ঠোঁটে সেই একচিলতে হাসি, ভাবালু জবাব,
'নীরা, তুমি থাকলেই তো আমি বেঁচে থাকব চিরকাল,
তুমি কি আমায় সত্যিই মেরে ফেলতে চাও?'

চকিতে নীরা হরিণীর মতো ঘুরে দাঁড়াল, উচ্চারণ করল 'আঃ
সুনীল, তবে এসো, আমরা দুজনেই একসাথে বাঁচি,
এইখানে, রাজপথে, জ্যোৎস্নায়, পারিজাতের সুউচ্চ বারান্দায়
কিংবা জ্যোৎস্নাকুমারী হয়ে আমি ছুটে যাব, তুমি কবিতা পড়বে,
হয় না, তা কি হয় না, সুনীল?'
'কেন হবে না নীরা? স্বপ্নে এবং অদৃশ্য স্পর্শে আমি
বারবার ছুঁয়ে যাব তোমাকে, এর চেয়ে বেশি
আর কী-ই বা দিতে পারে, এই বাউন্ডুলে ভুবনডাঙার কিশোর।

বাঁচো, তুমি বাঁচো নীরা, বাংলা কবিতায়
অবিনশ্বর নারী হয়ে বাঁচো ...।'

(সন্তোষপুর, কলকাতা)

মেঘ সাথী
সুস্মিতা ত্রিপাঠী ব্যানার্জী

এই মেঘ তুই বন্ধু হবি?
আমায় তোর সঙ্গে নিবি?
সুয্যিমামার দেশে যাব
তোর সাথে মন রং মেলাব
শীত সকালে কুয়াশা নরম
চাদরখানি ঢেকে;
দখিন হাওয়ায় ভাসব দুজন
শুনব ভোরের পাখির কুজন,
পুব আকাশে রাঙা কিরণ
দেবে যখন উঁকি,
আকাশ জুড়ে রঙের খেলায়
নেই যে কোনো ফাঁকি।

এই মেঘ তুই বন্ধু হবি?
আমার সাথে ঘুরতে যাবি?
বোশেখ মাসের তপ্ত বেলা
আগুন রাঙা দগ্ধ খেলা
দহন করি যন্ত্রণাদের
মন খারাপের ছুটি;
আকাশ জুড়ে শুধুই তখন
সুখের লুটোপুটি।

এই মেঘ তুই বন্ধু হবি?
আমার সাথে পথ হারাবি?
শরতের ওই নীল আকাশে
ছন্নছাড়া তোরই পাশে
ভাসব আমি দূর থেকে দূর
শারদ আবাহনে
ঢাকের কাঠি, পুজোর গন্ধ,
কাশের সাদা বনে।

এই মেঘ তুই বন্ধু হবি?
তোর আকাশে আমায় নিবি?

আলোছায়ার লুকোচুরি
বর্ষা এল মেঘের বাড়ি।
রামধনু রং মনমাতানো
অপূর্ব এক আলো,
এক পশলা টাপুর টুপুর
ঘোচায় যতো কালো।

এই মেঘ তুই আয় না সাথে
জীবন ডিঙার ধারাপাতে।
বিষণ্ণ সেই বিকেল বেলা
অস্ত রবির রঙের খেলা
যোগ-বিয়োগের হিসেবগুলো
মিলিয়ে দিতে হবে,
কালের টানে মেঘের দেশে
জীবন ভেসে যাবে।

(বড়িশা, বেহালা, কলকাতা)

তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব
স্বনাম গুপ্ত

প্রবল প্রলয়ে জলের তলায় কল
আর জলের তলায় রাস্তা।
দুর্দশার কী নিদারুন অবস্থা
তোমায় হৃদমাঝারে রাখব।
দুর্বিনীতের আস্ফালন
দুঃশাসনের থ্রেট।
জনগনের মুমূর্ষতা
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব।
সকল শ্রীতেই শ্রী হীনতা
সকল কাজে অনিশ্চয়তা।
শিক্ষাশ্রী তৈরি কর,
ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে কর উদ্‌বুদ্ধ
তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব।।

(বেহালা, কলকাতা)

মেরুদণ্ড
শুভশ্রী সরকার

শিশুর ভাব প্রকাশ বড়ই সরল, সাদা।
সে বৃহৎ পৃথিবীর আলো শুষে নিয়েছে নিশ্চিন্তে, নিজস্ব দাবিতে,
ভাবেনি দ্বিতীয় বার।

তার কথা, তার আধো বোল, সবই নিঃস্বার্থ, ভীতিহীন, নিঃসংকোচ।
কিন্তু বড়ো হয়ে ওঠার বিষাক্ত প্রাকৃতিক অভিশাপ
যখন রাহুর মতন গ্রাস করে তার সারল্য,
তৎক্ষণাৎ পরিণত হয় সে এক ভয়ংকর দানবে অথবা মেরুদণ্ডহীন মানবে।
পতন ঘটে মানবিকতার, সভ্যতার।
যুদ্ধ, ধর্ষণ, হত্যা, রাহাজানি
হয়ে ওঠে সভ্যতার নতুন নামকরণ।
মৃত্যু-মিছিল চলে শোকস্তব্ধ পৃথিবীতে,
বড়ো হয়ে ওঠে শিশু, হয় মূক ও বধির,
আবদ্ধ মুষ্টিতে সে বিভোর হয়ে থাকে
আন্তর্জালিক চলভাষে।

(আলিপুর কলকাতা)

দুটি কবিতা
ডা. বিপদতারন দাস
ক্ষুধা

নিশুত শেষে ক্ষুধাতুর,
শ্রান্ত, অচেতন শুয়ে;
হেমন্তের প্রত্যুষে
উন্মীলিত নয়নে
অপলক দেখে প্রান্তরে;
পেঁজা তুলোর গায়
পড়ে আছে
আস্ত অভুক্ত একটা রুটি;
দু-হাত বাড়ায়
পশ্চিমে
ক্ষুধা নিবারণে;
পুব হল লাল সাদা
অরুণ রাগে,
বিলীন হল চকিতে
অস্তমিত চন্দ্রিমা,
ক্ষুধাতুরের করুণ আর্জি
একখানি রুটি!
চোখ মেলে দেখে,
দুয়ার খুলে
দাঁড়ায়ে শিয়রে
রুটি হাতে রুটি-পরি!

চিত্র-বিচিত্র

মগজ নিংড়ে শব্দগুচ্ছ,
চিন্তনে ভিড় করে
অসাড় রাতে;
অক্ষিপুট স্তব্ধ করে
লিপি হয়ে ওঠে প্রতিবিম্বিত কত গাথা;
মগজের স্মৃতিপটে
চৌপর বন্দি হয়
ঘন নীল ক্যানভাসে মেঘ-শিল্পীর আঁকাজোকা;
শ্রাবণ গহন বর্ষণ শেষে
আবির রঙে
রাঙা হয় মেঘ-বালিকারা,
বুঝি অকাল হোলিতে
মাতোয়ারা
আজ মেঘ-যুবকেরা।

(খাজা আনোয়ার বেড়, বর্ধমান)

ভালোবাসা
কল্যাণ কুমার সুর

ভালো তো লাগে অনেককেই
কিন্তু ভালোবাসা কই?
ভালোবাসা চিরকালই বাধাবিপত্তি পেরিয়ে
বিরহী বকুল ছায়ায় বসে থাকে একা,
ভালোবাসায় কোনো চাওয়া-পাওয়া নেই
সশব্দ উচ্চারণে নয়
ভালোবাসা বেঁচে থাকে মননে, বিরহে,
নিরুচ্চার নীরবতা,
সযত্নে লালন করি ভালোবাসাকে
গভীর-গোপনে একা,
নিঃস্ব হওয়াতেই যেন তার অনন্ত আনন্দ।

(বেহালা, কলকাতা-৩৪)

সংখ্যা-তত্ত্ব
চিরপ্রশান্ত বাগচী

আপনার প্রতিটি রক্তবিন্দুর ভিতর.... হ্যাঁ, আমারই ঘাম রক্ত
স্বপ্ন অশ্রু মিশে আছে।
আপনি বিবেকবান; তবুও তার কণ্ঠরোধ করে
শূন্যে উড়ে
হিমায়িত কোনও কক্ষে প্রতিটি পদক্ষেপে রাজকীয় তকমা
এঁটে,
ক্রমে ক্রমে খুলে ফেলেছেন সেই পোশাক ...
যা পরলে আপনাকে এই ঘাস-মাটির ভিতরেই দেখতে পেতাম।

খবরের শিরোনামে
যেই আপনাকে দেখে আমাদের চোখ কপালে উঠে যায় ...
সঞ্চয়ের ইতিবৃত্তান্ত ফিরে আসে হাজার হাজার দীর্ঘশ্বাসে ...
আমাদের আইওয়াশের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে
আরও কিছু বিবেকী হৃদয়;
কখনও কখনও সেখানেও আরও কিছু ভ্রুকুটি, লুণ্ঠনের সামগ্রী
ইত্যাদি;
এতটাই ক্রিয়াশীল যে,
আমাদের অঙ্কে ভুল হয়ঃ
যোগফলে কোনও সাত নামে না, হাতেও কোনও সংখ্যাও নয়,
শুধু পেনসিলটাই ধরা থাকে।

(এটোয়া, ঘোষপাড়া, সাহাগঞ্জ, হুগলি)

ভাঙন
শুভদীপ সরকার

ঘণ্টা কাচে ঘুরছে সুখে বালি
গর্ত উপছে গড়িয়ে পড়ছে জল,
লোহিত সাগরে আদিমের উল্লাস
ভুখা পেটে বাজে বেজন্মা কোলাহল।
প্রসাধনীতে ক্লান্তি ঢাকে মেয়ে
প্রহর শেষে বদলে যাচ্ছে মুখ,
ভাঙা রেডিয়োয় নারীমুক্তির গান
চিকন শরীর নিলামে তুলছে সুখ।
তার চোখে ছিল নকশি-কাঁথার গল্প
পাঁচ ফুট ঘরে ভাঙনের চেনা রেশ,
অভাগী মেয়েটা দেয়ালে স্বপ্ন আঁকে
মনের মাঝে শব্দের সমাবেশ।
ঘাটের কাছে রুক্ষ কলস একা
স্রোতের টানে নুড়িরা নিরুদ্দেশ,
ভেজা বালিশে বিদ্রোহী যৌবন
ঠোঁটে বেঁচে কিছু পোশাকি প্রেমের রেশ।
প্রহরের আছে অতলের আহ্বান
উপত্যকায় এখনও টাটকা ক্ষত
ভোরের আকাশে মেঘের ক্লান্ত ঘাম
অনাহার বুঝি বাস্তবসম্মত!

(নেতাজিনগর, টালিগঞ্জ, কলকাতা)

পারিজাত মালা হাতে
প্রজ্ঞাপারমিতা মণ্ডল

রাধিকা এখনও এমনি
না, তিনি কেমনি
তিনি রাধারানি
তিনি সমাহিতা!
পুষ্প মাল্য গন্ধ বহে
তিনি পূজারতা
নাকি; যেমন-তেমন
হাতে প্রত্যহ খাওয়ান
নিজের আদরের নাড়ুগোপাল
বেণুগোপাল।
আজ আলুথালু
    মনে নেই তাঁর
তিনি কেমন
তিনি কে!
তিনি কী?
ওই যে ব্লিস পার্ক
যেখানে যেতে পথে
তোমার মন্দির পড়ে
অথবা আনাচকানাচ ঘুরি রাধামাধব
    ভজন আশ্রম।
আমি কি জানতাম ছাই
আজও তুমি আর
    বাঁশি বাজাওনা।
বাঁশি তোলা অবধি নেই তাকে।
কোথায় ফেলেছ, নিজেই মনে রাখ না।
মধুসূদন সরস্বতী!
তুমি ভজ আজকাল নিজেই।
পারিজাত মালা নেই, কণ্ঠে
    বৈজয়ন্তী।
সে ও ধূলায় লুটায় —
হস্তচ্যুত, হস্তশূন্য একটা — দুটো।
তুমি অপরাজিত! অপ্রতিম শ্রীজয়ন্ত।
রাধিকা না-হোক
রাধিকা আজন্ম একাকিনী থাক
আমিই তোমাকে বিবাহের
    প্রস্তাব দেব ভাবি।
বিগত শোচনা-নাস্তি, পদাবলি
নতুন ছন্দে পালা, নতুন পদ লেখা হোক।
        — ইতি চন্দ্রাবলী।

(বড়িশা, শীলপাড়া, কলকাতা)

অস্তিত্বের আদিম ইঙ্গিত
দীপঙ্কর মজুমদার

প্রস্তর খণ্ডে রক্তে খোদিত শিলালিপি
ছিল সুবিস্তৃত রাজ্য আর রাজত্ব।
মরচে ধরেছে যুদ্ধের অঙ্কুশে
থেমে গেছে বিজয় শঙ্খধ্বনি,

শুধু অন্তঃপুরে আজও বেজে চলেছে
বাইজির নূপুরের শব্দ আর কান্নার রোল।
বাতাস ম ম করছে জংলা মদের গন্ধে
সেখানে নগ্ন মেয়ে-যুবারা
জড়িয়ে চুম্বন করে পরস্পরকে।
গভীর দুখে সভ্যতা শোকার্ত;
তবুও বুদ্ধের দু-চোখ নিথর, অশ্রুহীন ...
হয়তো কোনো এক ত্রিপ্রহরে
শেষবারের মতো শুনতে পাব
সান্ধ্য ভাষায় অহিংসার অভয় মন্ত্র
বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সংঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

(ব্যারাকপুর উ. ২৪ পরগনা)

ভিন্ন ধারা
প্রতীপ মুখোপাধ্যায়

বর্ষে বর্ষে দলে দলে কত আঁতেল রসাতলে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সবজান্তা শিবের বাবা যেন জাহাঙ্গির ভাবা
ধরনধারণ সুবিধার নয়।।
চেতনার বক্ষ মাঝে কালিদাস বাসন মাজে
মধু-কবি গড়াগড়ি খায়।
বাসনার নলেন গুড়ে মন্দারমণি-শংকরপুরে
চিত-চোর বগল বাজায়।।
জমা জলে মশা নাচে নাপিতে কাপড় কাচে
বৃথা চেষ্টা মন্ত্রের সাধন।
পোয়াতি প্যাঁচার গান দিবারাত্র খানখান
প্যাঁচে পচে জনসাধারণ।।
হিড়িম্বার প্রেম-কথা ভীমের বুকেতে ব্যথা
অর্জুন সম্ভোগে আকুল।
বাকি সব করে রব যুদ্ধে স্থির মহানুভব
স্বর্গ-যাত্রা বিপদ সংকুল।।
বানরের আস্ফালন রামের প্রতিজ্ঞা পালন
হনুর ল্যাজেতে আগুন।
মেঘনাদ বীর-শ্রেষ্ঠ বিভীষণ না-মানে জ্যেষ্ঠ
এরে কয় কামনার গুণ।।

(নিউ আলিপুর, কলকাতা)

শাসক ও শাসিত
সুকুমার মণ্ডল

একটু আশার আলো জাগে তোমায় দেখে
ঘর বাঁধার স্বপ্ন জাগে প্রভাত থেকে
অপূর্ণতা পূরবে বুঝি তোমায় পেয়ে
কোয়েল যেন গাইছে সুরে সুর মিলিয়ে।
আমি তো আজ পাগলপারা
তোমার কথা শুনব বলে
ফোন বেজে যায় আশায় আশায়
সকাল-দুপুর-সাঁঝ-বিকেলে।

বলেছিলে সব পাবে, মনের আশা পূর্ণ হবে
খাবার পাবে, পোশাক পাবে, ঘর পাবে, বরও পাবে
তাই তো তোমায় ভালোবেসে সবই দিলাম
সংগোপনে রাজমুকুটটি পরিয়েছিলাম
রানি হতে চাইনি আমি, দাসী ক'রো
ভিক্ষাজীবী ছেড়ে আমায়।
তুমি নাকি রক্তপায়ী জলৌকা ন্যায়
ভয় হয় তাই পরের কথায়।

কেউ বলে, তুমি একটু ভালো আগের থেকে
ঘর, খাবার, জল দিচ্ছ নাকি ডেকে ডেকে,
আমি তো কিছু পাইনি দান
ভাঙায়নি কেউ তোমার মান,
আমার ভাগটা কোথায় গেল
কাক-শেয়ালে ছিনিয়ে নিল!
চাইতে গিয়ে পারব না আর
আর-একটি পা আর খোয়াতে
এমনি করে কাটিয়ে দেব শেষ ক-টা দিন
কেউ তোমরা এসো না আর মন ভোলাতে।

চোখ বুঝলেই দামি হব
পার্টির টাকায় ইনাম পাব
ধন্য হবে আমার এ দেশ
নাম ছড়াবে বিভুঁই বিদেশ।

আস্তরণে পড়বে ঢাকা
কেউ বেছে নেবে ট্রেনের চাকা।
তবু তুমি থাকবে, যাবে ...
শিরস্ত্রাণ নয়, শির বদলাবে
নিয়মটাতো একই রবে
রানি তোমায় ঠিক আগলাবে।

একলা ঘরে থাকবে যখন তুমি
হয়তো কেঁপে উঠবে তোমার প্রাণ
আমার জন্যে সবার জন্যে কী করেছ
হিসেবের খাতা করবে খান খান।
লাফিয়ে উঠে অস্ত্র হাতে
    আমায় তুমি খুঁজবে চারিধার
ভয় বড়ো যে কী কৌশলে
    নির্বাচনি বৈতরণী হবে তুমি পার?

(সোনারপুর, দ. ২৪ পরগনা)

দুটি কবিতা
জয়ন্ত সুকুল
মৃত্যু-খেলা

পেরিয়েছ অথই জল
মৃত্যুর অসংখ্য সীমানা
এবার হয়ত যাবে আর-এক সমুদ্রতটে
অজানা আশ্রয়ের খোঁজে
বুকে বেঁধে অমোঘ মৃত্যুর পরোয়ানা।
জীবনের সব সুখ স্বপ্ন-আবিল
ভেঙে গেছে ঘৃণার তাণ্ডবে, রোষে
শাসক আর জঙ্গির
অঙ্গুলিহেলনে শুধু মৃত্যু ঘোরে
জীবনের পাশে পাশে।
ঠাঁই নেই, নেই সকালের আলো
শুধু দেখি এখানে-ওখানে ভূমিতটে
ঘুমিয়ে রয়েছে নিরন্ন শিশু
শুধু ঢেউ, ঢেউ এসে তার
নরম পা দু-খানি চাটে
(সিরীয় শিশুর মৃত্যুকে স্মরণ করে)

ইচ্ছে-স্বপ্ন

মনে করো কিছু মনে নেই
সেসব তোমার জীবনে ঘটেছে উথাল-পাতাল
সেসব ছিলই অনিবার্য
শিশুর ভুলের মতোই, আপাতত
ঘাস-পাতায় আকীর্ণ পথটাকে
চিনে রাখো। এই পথেই তেত্রিশ কোটি
দেবতা হেঁটে যায় বৃন্দাবনে
হেঁটে যায় স্বপ্ন-চোরের দল!
মধুর কিছু স্মৃতির কথা মনে করো
অতলে তলিয়ে যেয়ো না আর
অন্ধকার ভেজা রাত্রির এলোমেলো
বাতাস এড়িয়ে চলো
কোনো কিছুতেই আপত্তি কোরো না
লাজুক ঋতুমতী বালিকার মতো
চোখে দেখতে দেখতে হৃদয়ের ঘ্রাণ বুঝতে
পারি, এবার গুটিপোকাদের মতো
তন্তুবায়ের বন্ধু হয়ে উঠব
চুপিসারে অপূর্ণ চিরজীবী হতে চায়
এমন ইচ্ছেগুলো শরীরের ওপর দিয়ে
হাঁটতে হাঁটতে এসে ঘা মারে
মস্তিষ্কের নরম শিরা-উপশিরায়
খুলে যায় সব জাগরণের দরজা-জানালা
এবার মনে করো কিছু মনে নেই!

(বেহালা, কলকাতা-৩৪)

হারিয়ে গেছে
স্নিগ্ধা পাল

হারিয়ে গেছে অনেক কিছুই
কালের স্রোতে ভেসে
হারিয়ে গেছে অনেক স্বপ্ন
বাস্তবতার রেশে।
হারিয়ে গেছে বন্ধু কত
হারিয়ে গেছে আশা,
হারিয়ে গেছে মানুষের প্রতি
মানুষের ভালোবাসা!
হারিয়ে গেছে কল্পনা সব
বিজ্ঞানের এই যুগে,
কাজের চাপে ইচ্ছেগুলো
একাকীত্বে ভোগে।
কৃত্রিমতায় আজ হারিয়ে গেছে
কত মাঠের সবুজ,
বাংলা-বাঙালি তেমনই হারাল
'গানের স্বর্ণযুগ'।
শহরের ঐতিহ্য সব
ট্রাম, টানারিকশা আর 'এক্কা'
সেসব আজ হারিয়ে গেছে
মেট্রো নিল জায়গা।
হারিয়ে গেছে কফি হাউসের আড্ডাগুলো
সময়ের সাথে সাথে —
মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিচয় আজ
'সোশ্যাল মিডিয়াতে'।
কত গল্পগাথা মুখ লুকাল
মুঠো ফোনের চাপে
মানবমুখের সৌন্দর্য সেও
মুখোশে মুখ ঢাকে।
পাশ্চাত্যের ভিড়ে আজ
প্রাচ্যের আভিজাত্য খুঁজি,
হায়রে! সভ্য সমাজ মোদের
হারিয়ে ফেলছে রুচি!
স্বার্থ লোভে কত মানুষ
হারিয়েছে মানবিকতা
মূল্যবোধকে শিকেয় তুলে
করছে বর্বরতা।
হারিয়ে গেছে এমন মানুষ
যে বিপদে মানুষের পাশে দাঁড়ায়
হায়রে! বর্তমানে কারও কাছে
'আস্থা' খোঁজাও দায়।

(পর্ণশ্রী, বেহালা, কলকাতা)

তবুও মানুষ
মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল

ভোরের আকাশটা এখনও অন্ধকারের মতো কালো,
বাতাসে ভেসে আসছে তীব্র বারুদের গন্ধ —
আগুনের গোলায় পুড়ছে সবুজ মাঠ, শিশুর শরীর,
সবুজ ঘাসে রক্তের আলপনা!
লোভী শকুনের দল উড়ছে রক্তের সন্ধানে,
ধারালো নখের মাঝে ফুটে উঠছে জান্তব নিষ্ঠুরতা।
জেগে উঠল দানব —
দানবের দানবীয় হাসি বিদ্রূপ করছে মানবতাকে,
নেকড়ের নিষ্ঠুরতা নিয়ে ছুটে চলছে
পূর্ব থেকে পশ্চিমে উত্তর থেকে দক্ষিণে।
তবুও আমরা বোবা হয়ে আছি,
আমরা মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত ভীরু মানুষের দল —
যে মানুষ প্রতিবাদহীন; মনুষ্যত্বহীন,
হে পৃথিবী! আমাদের ক্ষমা করো।

(খড়দহ, উ. ২৪ পরগনা)

প্রেম
নিরাশাহরণ নস্কর

বাঁধন সে তো আলগা হবেই,
বাঁধনের আর দোষ কি বলো?
গিঁট দিয়ে কি বাঁধন থাকে?
ঘুচারে পাগল মনের কালো।

বাঁধনবিহীন-বাঁধনই যে
সব চেয়েরে শক্ত বাঁধন;
হৃদয় দিয়ে রাখরে বেঁধে
সেই তো বড় প্রেমের সাধন।

(বারুইপুর দ.২৪ পরগনা)

কুকুর ছানা
প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস

ভোরবেলা পাখির ডাকে
সূর্য ওঠার ফাঁকে —
দেখি একটি কুকুর ছানা
খুঁজে বেড়ায় মাকে।
কিঁউ কিঁউ করে এদিক-ওদিক
ঢলে ঢলে শুধু পড়ে,
দাঁড়ানোর তার নেই ক্ষমতা
অনাহারে বুঝি মরে।
ব্যাকুল হয়ে কোলে নিলাম
ছোট্টো শিশু ভেবে —
হোক-না পশু তবুও ওরা
হৃদয় ভরে দেবে।
গরম দুধ বোতলে ভরে
খাইয়ে দিলাম হাতে,
সারাদিন শুধু খেলেই গেল
ঘুমিয়ে পড়ল রাতে।
গায়ে-মাথায় হাত বোলালাম
ঢেলে কোমল হৃদয়
আমার বুকে মুখটি গুঁজে
রিক্ত যে তার বিদায়।
সারা রাতের সঙ্গী হল
আমার সাথে থেকে
সকাল হলে পালিয়ে গেল
শুধুই স্মৃতি রেখে।
তাকিয়ে দেখি কল্পনাতে
ল্যাজ দোলানোর ছবি,
ছড়িয়ে দিল ভালোবাসা
পুব আকাশের রবি।

(দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-২৮)

বর্ষা
আরতি ভট্টাচার্য্য

বৃষ্টি এল ঝমঝমিয়ে বর্ষা শুরু আজ,
রবি মামা দেয়নি হামা, কোথায় যেন কাজ।
মদনা মাঝি নৌকো নিয়ে বসে ঘাটের পাড়ে,
ভাবছে তবে কেউ যাবে না সবাই রবে ঘরে!
চাষি ভায়া বলদ নিয়ে হালটি ধরে কসে,
ঠিক চলেছে মাঠের পানে ফসল বোনার আশে।
মেনি বেড়াল চুপটি করে বসে ঘরের কোণে,
জলেতে তার বেজায় যে ভয়, শিকারে যাবে কেমনে?
খোকা-খুকি আনন্দেতে নাচে তা ধিন ধিন
আজ যে তাদের রেনি-ডে, স্কুল ছুটির দিন।
সার বেঁধে সব ছুটছে মাঠে কিশোর ছেলের দল
জলে-কাদায় এমন দিনেই খেলতে মজা বল।
খুকুমণি ভিজছে জলে বসে উঠোনেতে
গুড়ুৎ গুড়ুৎ টানছে হুঁকো দাদু মনের সুখে।
খিচুড়ি আর পেঁয়াজিতে জমবে ভোজন খাসা,
হতেও পারে তার সঙ্গে আলুরদমের কষা?
বৃষ্টি ভিজে স্নান করতে কী-যে মজা হয়
যে করে তা, সেই তো বোঝে, আর কেউ নয়।
ঠাকুমারা দেখলে পরেই আসবে তাড়া করে —
'ভিজলে পরে হবে যে জ্বর, যাসনে খোকা ওরে।'
মা বলেছেন বৃষ্টি ভিজে তারাও করত স্নান।
তবে কেন মোদের বেলায় এমনতর সাবধান?
সব নিয়ম কি বদলে গেল আমাদেরই বেলায়!
এই চিন্তাই খোকা-খুকুর মনকে বড় ভাবায়।

(সোনারপুর দ. ২৪ পরগনা)

নীড়
মঞ্জুশ্রী রঙ্গা

দালান কোঠা মাথায় ছাদ
গাছের পাতায় আলতো চাঁদ ...
ধুইয়ে দিল আলোয় সেথা
লক্ষ তারা পুঞ্জ
সেইখানেতেই ছিল আমার
সুখের মিলন কুঞ্জ।
সঙ্গী ছিল সেথায় আমার
ছোট্টো প্রিয় সাথি,
কালের গ্রাসে হারিয়ে গেল
দিয়ে আমায় ফাঁকি!
আমি এখন তোমায় ভাবি
একলা বিজন ঘরে,
সঙ্গে আছে আর-এক প্রিয়
সে নেয় আপন করে।
যার ব্যথা তো সেই তো বোঝে,
সখী; অন্যে বোঝে বল?
পারবে না তো মোছাতে কেউ
আমার চোখের জল!
সহায় আছেন পরম পিতা
সবই জানেন তিনি
সেই ছাড়া তো নেইকো গতি
শক্তিদাতা যিনি।
সবার সঙ্গে হাসিখুশি
লক্ষ জনের ভীড়ে
তবুও আছি আমি আমার
দুঃখ-সুখের নীড়ে।

(হরিদেবপুর, কলকাতা)

ছোটোগল্প

পাঁঠারসিক পরশবাবু

ড. গৌতম ভট্টাচার্য্য

আমরা বাঙালিরা পাঁঠা ভালোবাসি খুব। রবিবারের কলকাতার সকালে অনেক বেচারা পাঁঠা দেহ রাখে যাতে আমাদের মধ্যবিত্ত বাঙালির দুপুরের ভোজটা একটু জমজমাট হয়। কিন্তু আমেরিকায় সুপার মার্কেটে পাঁঠা পাওয়া যায় না। ওরা অনেক বিফ খায়, শূকরের মাংসও খায়। যদি খুব বড়ো শহরে থাকেন, সেখানে অনেক প্রবাসী লোক থাকে, যারা জামাইকা, পুয়েরতো রিকো এসব দেশ থেকে এসেছে। ওরাও পাঁঠা ভালোবাসে খুব, আমি জামাইকার লোকেদের রেস্তোরাঁয় একবার মাটন খেয়েছিলাম, খুব ভালো খেতে। ওই সব দেশের লোক বা বাংলাদেশিদের বিশেষ খাবারের দোকান থাকলে সেখানে মাটন পাবেন। কিন্তু আমেরিকার অন্য শহরে পাঁঠা পাওয়া দুষ্কর।

প্রায় তিরিশ বছর আগে আমেরিকার যে খুদে শহরে আমরা থাকতাম সেখানেই পরশবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। অনেকদিন ইন্ডিয়াতে ভালো চাকরি করতেন, তারপর ছুটি নিয়ে এসেছিলেন পি এইচ ডি করার জন্যে। আমি যদিও অধ্যাপক, আর উনি ছাত্র, আমাদের বয়েস মোটামুটি একই, এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে আর কী। মাঝে মাঝে আড্ডা হত। লোকটা ভালো কিন্তু মাথায় সবসময় নানারকম ধান্দা ঘুরছে।

একদিন বলল, 'জানেন তো, আমার বাবা-মা বেড়াতে এসেছেন দেশ থেকে। ইলিশ মাছ তো পাওয়া যায় না, ভাবছি একদিন পাঁঠা কিনে ওদের যদি খাওয়ানো যায়।'

আমি তো একদম না-করে দিলাম। 'এখানে মার্কেটে কত রকম সবজি, চিকেন, ভেড়া সব পাওয়া যায়, বেশি পয়সা দিলে ভালো চিংড়ি মাছ পাওয়া যায়, খাওয়াদাওয়া তো ভালোই হয় নিশ্চয়ই, কেন আর পাঁঠা খুঁজে সময় নষ্ট করবেন? জানেন-তো এখানের দোকানে ওসব পাওয়া যায় না।'

পরশবাবুর উৎসাহ কম নয়। উনি বললেন, 'এখান থেকে প্রায় ২০ কিমি দূরে একটা কসাইয়ের দোকান আছে গ্রামের মধ্যে, সেখানে অনেক রকমের মাংস বিক্রি করে। চলুন না রবিবার সকালে, যদি পাঁঠা কিন্তু পাওয়া যায়।'

রবিবার সকালে আমি গাড়ি চালিয়ে ওর সঙ্গে দোকানটাতে চলে গেলাম। পাঁঠা পাওয়া গেল না।

'অনেক হয়েছে, চলুন বাড়ি যাই', আমি বললাম।

পরশবাবু ছাড়বার লোক নয়। দোকানের সব কর্মচারীকে ধরে ধরে প্রশ্ন করতে লাগলেন, 'এখানে কোথায় গোট মিট পাওয়া যাবে জানেন?'

ওদেরই একজন বলল, 'এখান থেকে দশ কিমি দূরে একটা গ্রামে জীবজন্তু নিলাম হয় প্রতি রবিবার সকালে। সেখানে মাঝে মাঝে পাঁঠাও থাকে।'

'চলুন যাই', পরশবাবু একপায়ে খাড়া।

আমি একটু অবাক হলাম, 'যতদূর শুনেছি ওই সব জায়গায় চাষিরা গোরু-বাছুর, শুয়োর এইসব নিলাম করে তো, পাঁঠা আবার কে আনবে?' তারপর জ্যান্ত পাঁঠা নিয়ে আপনি কী করবেন? 'সে আমি ব্যবস্থা করে নেব, আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না, আগে চলুন না', ওনার উৎসাহের আর শেষ নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, ওনার প্রতিশ্রুতি খুব একটা সুবিধের মনে হল না। আমি পেশায় অধ্যাপক, জন্তুজানোয়ারের সংগে খুব একটা মেলামেশা হয় না, যদিও ছাত্রদের মধ্যে কিছু পাঁঠা তো সবসময়েই দেখতাম।

কৌতূহলের বশে চলে গেলাম আর দশ কিমি গাড়ি চালিয়ে। বড়ো একটা মাঠের ওপরে অনেক চাষি তাদের গাড়ি, ট্র্যাক্টর, ছোটো লরি এই সব পার্ক করে রেখেছে। পাশে বিরাট তাঁবু খাটিয়ে নিলাম হচ্ছে।

গোরু-বাছুর, শুয়োর এই সবই বেশি দেখা গেল, তাঁবুর বাইরে এক জায়গায় তাদের রাখা হয়েছে, নম্বর ডেকে ডেকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হবে নিলামের জন্যে।

মাঠের অন্য দিকটা কিন্তু একদম চিড়িয়াখানা! আমরা তো দেখে অবাক! বোঝা গেল, চাষিরা বাড়িতে অনেক জন্তুজানোয়ার পোষে শখ করে, সেইগুলো থেকে আবার মাঝে মাঝে কিছু বিক্রি করে দেয়। দেখলাম টার্কি মোরগ, এমু পাখি, লামা, আলপাকা, খরগোশ, ময়ূর, ইগুয়ানা আরও কত কী! কত রকমের পাখিও রয়েছে নিলামের জন্যে।

পাঁঠা? তাও ছিল। দুটো অ্যাংগোরা গোট, একদম সাদা। বড়ো বড়ো লোম গায়ে, কী সুন্দর দেখতে — ইউরোপের জন্তু।

পরশবাবুর জিভে জল আসে আর কী। 'এগুলো খেতে একদম ফার্স্ট ক্লাস হবে দাদা!'

আমি বললাম 'আপনি কি পাগল হয়েছেন। এদের লোম থেকে খুব দামি পশম হয়, ইউরোপে তার সোয়েটার বিক্রি হয় প্রচুর দামে। এ কেউ খায় নাকি? একটা ছাগল প্রায় দশ হাজার টাকা দাম হবে, বা আরও বেশি।'

এই কথা শুনে পরশবাবু দমে গেলেন একটু

(২০২১ খ্রিস্টাব্দে আমি ইনটারনেটে অ্যাংগোরা সোয়েটার বা মহেয়ার সোয়েটারের দাম চেক করলাম, ইউরোপে ফ্যান্সি দোকানে বিক্রি হচ্ছে ২/৩ লক্ষ টাকা দামে। আবার চিনেরা ওই একই জিনিস ৬/৭ হাজার টাকায় বিক্রি করছে। জাল অ্যাংগোরা গোট না জাল সোয়েটার না ধাপ্পাবাজি কিছু-ই বুঝলাম না!)

তবে কয়েক মিনিট পরেই একটা লরি এল, তার পেছন থেকে দুটো কচি ছাগল তড়াক করে এক লাফে নেমে এল। পরশবাবু কী খুশি! তাঁবুর মধ্যে ঢোকা হল। একটা বড়ো গ্যালারিতে সব ক্রেতারা বসে আছে, তলায় একটা টেবিল, সেখানে কাগজপত্র আর একটা হাতুড়ি নিয়ে বসেছে নিলামদার আর তার সহকারী।

এক এক করে পশু আসে, আর গ্যালারির ওপরে বসা ক্রেতারা হাত তোলে যদি দাম পছন্দ হয়। আস্তে আস্তে দাম বাড়তে থাকে, যখন একজনও হাত তুলছে না, তখন সব থেকে বেশি দামের ক্রেতাকে বেচে দেওয়া হয়। দাম ঠিক হলে হাতুড়ি মারা হয় একবার, মানে নিলাম শেষ, পরের আইটেম নিয়ে এসো।

তা আমরা গ্যালারির অনেক ওপরে বসেছিলাম। প্রথম ছাগলটা এল, লোকে দাম বলতে শুরু করল। কিন্তু পরশবাবুর দিকে কেউ নজর দিল না, চটপট আর-একটা লোক ছাগলটা কিনে নিল।

পরশবাবু খেপে খেলেন খুব। ছুটে তলায় গিয়ে নিলামদারকে কী বকুনি 'আমরা মজা করতে আসিনি, আমাদের দিকে একটু নজর রাখবেন স্যার।'

আর-একটা ছাগল এল। কেউ খুব একটা উৎসাহ দেখাল না। আর আমরা একদম কিনে নিলাম তাকে তেইশ ডলারে। আর তারপরেই যত গণ্ডগোল।

কিছুক্ষণ পরে, টাকা জমা দিয়ে, আমরা তখন পার্কিং-এর মাঠে আমার গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে আছি। আমার পাশে গর্বিত পরশবাবু পাঁঠার দড়ি ধরে আছেন, আর পাঁঠাটা ব্যা ব্যা করছে।

'হুম, এবারে কী করা হবে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

একটু আমতা আমতা করে উনি বললেন 'আচ্ছা বলছি কি, আপনার গাড়িতে যদি ওকে চাপিয়ে কসাইখানায় নিয়ে যান, তা হলেই হবে।'

আমি এই শুনে তেলেবেগুনে চটে গেলাম 'এই আপনার প্ল্যান ছিল? আমার গাড়ি খুব পরিষ্কার, কোনো গন্ধ নেই। ওখানে পাঁঠা ঢুকলে এখুনি হিসি করবে, আরও কী করবে বুঝতেই পারছেন। দু-বছর সেই গন্ধ থেকে যাবে। আমার আমেরিকান সহকর্মী কাউকে গাড়ি চড়ালে সে ভাববে আমারই গায় পাঁঠার গন্ধ! ছি ছি!

'আমি সব পরিষ্কার করে দেব, কথা দিচ্ছি, প্লিজ।'

'বললেই হল, পাগল নাকি, কোনো পাঁঠা আমার গাড়িতে ঢুকবে না।'

তারপর আমি বললাম, খুব শান্ত গলায় 'দেখুন, আপনার দুটো অপশন আছে। এখান থেকে পাঁঠাকে নিয়ে হেঁটে যান কসাইখানায়, দশ কিমি দূরত্ব, দেখতে দেখতে পৌঁছে যাবেন! অথবা আমি এখন ২০ কিমি গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যাব, সেখানে খুঁজে দেখব কোনো প্রতিবেশীর ছোটো লরি আছে কিনা। যদি থাকে, তিন ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসব একদম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন, পাঁঠার সঙ্গে গল্প করেই সময়টা কাটিয়ে দেবেন।'

এই শুনে পরশবাবুর মাথা খারাপ হয়ে গেল।

যে গেট দিয়ে লরিগুলো বেরিয়ে যাচ্ছিল, সেখানে দড়ি হাতে ধরে পরশবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন। একটা করে লরি বেরোয় আর পরশবাবু তাকে থামিয়ে, কী কাতর অনুরোধ 'দাদা, আমার পাঁঠাকে একটা লিফট দেবেন আপনার লরিতে?'

আমি জীবনে খুব কমই অত হেসেছি। মোটাসোটা এক বাঙালিবাবু ঘামতে ঘামতে, পাঁঠার দড়ি ধরে এক গাড়ি থেকে আর-এক গাড়িতে যাচ্ছেন ছুটে ছুটে, হাঁপাতে হাঁপাতে আর পাঁঠাটা সমানে ব্যা ব্যা করে ডেকে চলেছে। এরকম দৃশ্য আমেরিকায় আমি কোনোদিন দেখিনি। আমেরিকান চাষিরা কেউ অবাক হল, কেউ মজা পেল, সবাই ওকে কাটিয়ে গেট দিয়ে বেরিয়ে গেল। পরশবাবু আস্তে আস্তে মুষড়ে পড়ছেন দেখলাম। হায় ভগবান!

আমার পেটটা হাসতে হাসতে প্রায় ফেটে যায় আর কী। কিন্তু ভগবান আছেন!

একটা ভাঙা লজঝড়ে লরি করে ভগবানের উদয় হল। দেখতে একদম আমেরিকান চাষিদের মতো। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, নোংরা ওভার অল, সামনের দাঁত অর্ধেক নেই।

ভগবান বললেন 'অবশ্য আপনার পাঁঠা নিয়ে যাব। তবে ট্যাক্সি ভাড়া লাগবে।'

ছুটে গিয়ে পরশবাবু পাঁঠাকে তার লরিতে তুলে দিলেন। মুখে একগাল হাসি। আমার কাছে এসে বললেন 'দাদা আমি ওই লরিতে চেপে যাচ্ছি, আপনি পেছনে পেছনে আসুন।'

আমি বললাম, ওই লজঝড়ে গাড়ি চড়া কেন, ওতে এসি পর্যন্ত নেই, এই গরমে কষ্ট করার কী দরকার?'

‘যদি আমার পাঁঠা নিয়ে ও ভেগে পড়ে?’

আবার আমার হাসি পেল ‘ও আপনার ছোটো একটা পাঁঠা চুরি করে জেলে যাওয়ার ঝুঁকি নেবে, আপনি পাগল নাকি?’

‘কাউকে বিশ্বাস নেই দাদা, সাবধানের মার নেই।’ পরশবাবুর ভগবানের উপর বেশি আস্থা নেই দেখলাম।

পাঁঠার ট্যাক্সি ঠিকই পৌঁছোল কসাইখানায়। কিছুক্ষণ পরে আমরা দুজনেই হাতে একটা করে বড়ো বাক্স নিয়ে বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। প্রত্যেকের ভাগে সাড়ে সাত কিলো কচি পাঁঠার মাংস। সাংঘাতিক ভালো খেতে। আমরা খেলাম, অন্যদের নেমন্তন্ন করে খাওয়ালাম, অনেক সপ্তাহ আর মাংস কেনার দরকার হয়নি।

খরচা কত হল? তিরিশ বছর আগে, পাঁঠার দাম ২৩ ডলার, ট্যাক্সি ৩ ডলার, কসাই ৯ ডলার আর ৬০ কিমি গাড়ি চালানোর জন্যে তেল, আর নিলাম ঘরের দুটো টিকিট এক ডলার। যদি প্রশ্ন করেন ২০২১ সালের কলকাতার টাকায় এর মূল্য কত হবে, সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দেওয়া শক্ত হবে। কারণ দেখতে হবে আমেরিকায় তিরিশ বছরে কত মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, ইন্ডিয়াতে কত মূল্যবৃদ্ধি হয়েছে, তারপর ডলার/রুপি বিনিময়ের হার কতটা বদলেছে — একটা ছোটো গবেষণাপত্র লিখতে হবে আর কী!

তা না-করে সোজা উত্তর দিচ্ছি, যা মোট খরচা হয়েছিল ১৫ কিলো মাংসের জন্যে, আমেরিকায় ১৫ কিলো চিকেন কিনতে ওই সময় অন্তত আড়াই গুন বেশি পয়সা লাগত। সুতরাং পরশবাবু সত্যিই আমাদের অনেক পয়সা বাঁচিয়ে দিয়েছেন সেদিন।

মাস দুয়েক পরে পরশবাবু ফোন করলেন, ‘জানেন আমার ছোটো গাড়িটা বেচে একটা ছোটো লরি কিনব ভাবছি। সবজি পাইকারি কেনা যাবে, আসবাবপত্র যন্ত্রপাতি এই সব আনতে কোনো ঝামেলা হবে না।’

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ‘আর মাঝে মাঝে পাঁঠাও কেনা যাবে। তবে ছেলেমেয়ে, বউ ওদের নিয়ে চলাফেলা করবেন কী করে? এ তো ইন্ডিয়া নয়, লরির পেছনে বাচ্চাদের চাপালে পুলিশ বিরাট ফাইন করবে।’

‘ওই আমি লরি চালাব, আর পাশের সিটটায় তিনজন গাদাগাদি করে বসে যাবে আর কী।’ এটা বলার পরে পরশবাবু আবার নিজেকেই শুধরে নিলেন।

‘না দাদা, ও সব হবে না, বউ এসব শুনলে চটে বোম হয়ে যাবে।’

পরশবাবু পাঁঠা রসিক হতে পারেন, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক। বউকে চটিয়ে পৃথিবীতে কোনো কাজই হয় না!!

(প্রবাসী, ভারতীয়)

শব্দতরঙ্গ - ২
সূত্র ঃ সায়ন্তিকা

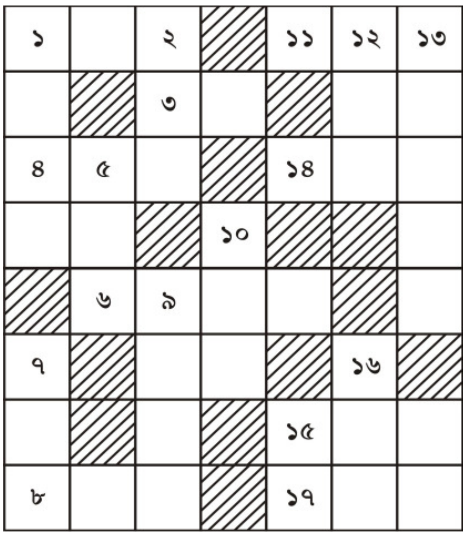

সংকেত-সূত্র

উপর-নীচ

১। কাজের দেখাশোনা করা; ২। মুখমণ্ডল; ৫। মেঘ
৭। শব্দবিশেষ যার আক্ষরিক অর্থ জ্ঞানী; ৯। ইসলাম ধর্মের বিশেষ মাস; ১০। মুসলিম প্রাদেশিক শাসক; ১২। পিতা/জন্মদাতা; ১৩। বিশেষ ধরনের চোখ বিশিষ্ট নারী; ১৫। এক প্রকার ফল/সবজি
১৬। মৎস শিকারি উপজাতি

পাশাপাশি

১। ডেকে পাঠানো; ৩। মূল্য; ৪। বার্নিশের উপকরণ;
৬। রাজসভা; ৮। নিবারণ/শাসন; ১১। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস;
১৪। অলংকারবিশেষ; ১৫। বিশেষ আদিবাসী সম্প্রদায়;
১৭। বাংলা ঋতুবিশেষ।

বাঁশ ফুল

অপূর্ব কর্মকার

আজ খুব ভোরে খুমির ঘুম ভেঙে গেছে। রবিবার, স্কুল যাওয়ার তাড়া নেই। খোলা জানলার বাইরে আকাশ। নীল আর গোলাপি রঙে দাগানো। দিনমণি দৃশ্যমান হতে শুরু করেছে। জানলার সামনেই লাল আর নীল রঙের ভানাদা ফুল ভরতি দুটো গাছের হালকা ডালপালাগুলো মৃদুমন্দ হাওয়ায় দুলছে। গাছগুলোর একদিকে মৌতাক (বাঁশ)-এর ঘন বুনো জঙ্গল, আর একদিকে তাদের আদিগন্ত সবুজ ধানের খেত। সবে ধান রোয়া হয়েছে। রান্নাঘর থেকে ময়দা আর চটকানো পাকা কলার পাগলপারা ম ম গন্ধ ভেসে আসছে। তার মানে মা অনেক আগেই রান্না শুরু করে দিয়েছে। মা নিশ্চয়ই কোঠা পিঠে রাঁধবে বেশ অনেকটাই। ময়দা ও পাকা কলা দিয়ে তৈরি এই পিঠে যে তাদের অতি প্রিয় খাবার। মা মেয়ের কথা রেখেছে। সে আর শুয়ে থাকতে পারল না। চকিতে রান্নাঘরে ঢুকতেই মা জিজ্ঞাসা করল, 'এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লি যে? যাবি তো আরও বেলায়। বন্ধুরা তোর আগে সবাই আসুক তবে তো'। আজ সে ও তার স্কুল গভর্নমেন্ট ভেনসাং মেসার্স স্কুলের পড়ুয়ারা কুমতু, লারা, লাইমি, লাই, জোফেইদের সঙ্গে দল বেঁধে সাত-আট কিমি দূরে চম্পাই নদীর পশ্চিম পাড়ে যাবে। গত সপ্তাহেই হেডমাস্টার থাংগা স্যারের কথা মতো যাওয়া ঠিক হয়েছে। দু-মাস আগে সেখানে দশ-বারোটা পরিবার কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে তাদের নানা বয়েসের সদস্য এমনকি দুগ্ধপোষ্য শিশুদেরও নিয়ে বহু দূরবর্তী মায়ানমার সীমান্ত পার হয়ে মিজোরামে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। ওরা শরণার্থী বা উদ্‌বাস্তু, সহায়সম্বলহীন, চালচুলোবিহীন এক হতভাগ্যের দল। মায়ানমারে চিন জনগোষ্ঠীভুক্ত। প্রাণভয়ে বাধ্য হয় সীমান্ত পেরিয়ে সপরিবারে মিজোরামের চম্পাই নদীর পশ্চিম পাড়ে আশ্রয় নিতে। স্যার ওদের অস্থায়ী বস্তিগুলো আগেই দেখে এসেছেন। উনি ওদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চাক্ষুস অভিজ্ঞতা অর্জন করে তবেই প্রত্যেকের নিজ নিজ লিখিত প্রজেক্ট রিপোর্ট স্কুলে জমা দিতে বলেছেন। পরে সেগুলো একত্র করে ডেপুটি কালেক্টরের কাছে পাঠানো হবে। পরে মিজো সাংসদ ভ্যানলালভানার কাছে পাঠানো হবে ওদের আরও সাহায্যের জন্য। এতে নিঃসন্দেহে তাদের স্কুলের সম্মানও বাড়বে বই কী।

আস্তে আস্তে সকল সহপাঠী ও সহপাঠিনীরা এসে উপস্থিত হলে খুমিরা যাত্রা শুরু করল। প্রত্যেকের পিঠে তাদের ব্যাকপ্যাক। যে-যা পেরেছে খাবারদাবার নিয়েছে। কেউ নিয়েছে ফল, মিষ্টি আবার কেউ বোতলে ভরে নিয়েছে গরম দুধ। মায়ানমার থেকে আসা পরিবারদের দেওয়ার জন্য। খুমিরও ব্যাকপ্যাকে রয়েছে সেই অগুন্তি কোঠা পিঠেগুলো।

সূর্য মধ্য গগনে না-এলেও বাতাসে মৃদু গরমের হলকা। উঁচুনীচু পাহাড়ি পথ। আঁকাবাঁকা, মাঝে মাঝে পিচঢালা। এক দিকে ধান, আনাজের চিরহরিৎ খেত, আর-এক দিকে অনুচ্চ লাল পাথরের টিলা-কোথাও একদম নেড়া গাছপালাহীন আবার কোথাও বা গাছগাছালিতে ঘন আকীর্ণ। মাঝে মাঝে মৌতাকের ঘন জঙ্গল। জমিতে যেন সবুজ হলদেটে তাজা আর শুকিয়ে যাওয়া পাতার আঁকা ক্যানভাস। দৃষ্টিভ্রম হয়। দূর থেকে যেন মনে হয় বাঁশ গাছের ফুল নীচে পড়ে আছে। কিন্তু তা তো হওয়ার নয়। বাঁশ ফুল যে প্রতি আটচল্লিশ বছরে জন্মায়। ফুল পেকে গেলে ভেতর থেকে সাদা সাদা বীজ ঝরে পড়ে, তার থেকে আবার গাছ হয়। বাঁশ গাছ নাকি আশি বছরের বেশি বাঁচে। জনশ্রুতি, ফুল ফুটলে নাকি দাবানল, ভূমিকম্প, মহামারি, দুর্ভিক্ষ, বন্যা ইত্যাদি দেখা দেয়। শেষবার নাকি ১৯৫৮-৫৯ সালে দেখা গিয়েছিল। ক্রমশ অনেকটা পথ এসে পড়ে খুমিরা। খানিক বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করে ওরা। বেলা পড়ে আসছে। সূর্যের তাপ এখন বেশ কম। আর ও কিছুক্ষণ হাঁটার পর এবার তারা চম্পাই নদীর পশ্চিম পাড়ে এসে উপস্থিত হয়।

চারদিক বেশ জনমানবহীন। দুটো নৌকা বাঁধা নৌকাঘাটে। কাউকে দেখা যায় না। মিজোরাম-মায়ানমার বর্ডার এখান থেকে প্রায় ১০০ কিমি দূরে। পাড়ের চারদিকে চোখ মেলতেই কিছু লোকজনকে এবার এক জায়গায় দেখতে পায় খুমিরা। আর ও সম্মুখীন হতে দেখতে পায় কতকগুলো বাঁশের কাঠামোর অস্থায়ী চালাঘর, চাঁচাই ঘেরা। মাথা কালো প্লাস্টিকে ঢাকা, হাওয়ায় পতপত করছে। অনুমান করতে ভুল হয় না ওরাই তারা যাদের জন্য আসা। সামনের খানিকটা জলকাদাময় পরিসরে ১০-১২টা নোংরা জামাকাপড় পরা অল্পবয়সি ছেলে-মেয়ে খেলা করছে। মিলিজুলি কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা ইটের উনুনে বাঁশের জ্বালানিতে রান্না করার তোড়জোড় করছে। দু-এক জনের হাতে বাঁশের কঞ্চি কাটা হাত ছিপ। ওদের বেশভূ ষা মলিন, চুল উসকোখুসকো, শনের মতো, যেন অনেকদিন তেল পড়েনি। মুখে ক্লান্তিময়তা, অস্থিরতা, উন্মনার ছাপ। রাতে যেন অনেকদিন ভালো করে ঘুমোতে পারেনি। ওদের দেখে ছেলে-মেয়েগুলো তড়িঘড়ি এসে বিস্মিত কৌতূহলে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। যেন কতদিন তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে দেখেনি এই নিরালা বসতিবিহীন পরিবেশে। কয়েকজন ছেলে-মেয়েদের হাতে বই, খাতা, পেনসিলও দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল। নিজেদের ভাষায় নিজেদের মধ্যে খুমিদের উদ্দেশ্যে কী যেন বলতে চেষ্টা করছিল। খুমিরা কেউই ওদের ভাষা জানে

না। এরই মধ্যে বাকি পুরুষ আর মহিলারাও এসে হাজির হয়। এদের মধ্যে দুজন মহিলার হাতে কাপড় জড়ানো দুটো কোলের শিশু। এদের মধ্যে অধিক বয়সি একজন পুরুষ খুমিদের পরিচয় জানার পর ওনাদের সকলের সঙ্গে প্রতি পরিচয় করিয়ে দিল। মুখে-চোখে তাদের অব্যক্ত হাহাকারের ভাগ্যহত যন্ত্রণা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন, 'আমরা মায়ানমারে চিন জনগোষ্ঠীভুক্ত। আমাদের মধ্যে কেউ খ্রিস্টান, কেউ-বা মুসলিমও আছেন। আমরা বেশির ভাগ পুরুষেরা মায়ানমারে পুলিশ ও দমকল বিভাগে চাকরি করছিলাম। গত মার্চ মাসেও সব দিক সুস্থির স্বাভাবিক ছিল। যদিও রাখাইন প্রদেশে রোহিঙ্গাদের নিয়ে আগে থেকেই সরকার জেরবার ছিল। তাদের সমস্যার কোনো স্থায়ী সমাধান করতে পারেনি সরকার। কিন্তু ঠিক গত জানুয়ারি মাস থেকেই রাজনৈতিক হিংসা ও অশান্তির লেলিহান আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করে। তা আরও ঘনীভূ ত হয় পরের পয়লা ফেব্রুয়ারিতেই যখন সামরিক অভ্যুত্থানে তাতমাদাও-এর জুন্টা সরকার দেশের গণতান্ত্রিক সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে স্টেট কাউন্সেলর আউং আন সু চি-সহ অনান্য নেতাদের কারাগারে বন্দি করল। মায়ানমার সরকার বুদ্ধের থেরোবদা পথানুগামী। গ্রেপ্তার হওয়া নেতারা সবাই বুদ্ধের থেরোবদা পথকেই জানেন ও মানেন। জুন্টা সরকারের কোনো ধর্ম নেই। পালটা পদক্ষেপে সাধারণ নাগরিক, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুব সংগঠন, সাংবাদিকরা প্রতিবাদ-প্রতিরোধে গর্জে উঠল জুন্টা সরকারের বিপ্রতীপে। দুর্নীতিপরায়ণ ও ক্ষমতালোভী জুন্টা ফুঁসে উঠল। প্রথমে লাঠিচার্জ, ক্রমে রবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস, পরে গুলি ছুড়ে সম্মিলিত বিরোধ, বিক্ষোভ দমন করা আরম্ভ করল। প্রতিবাদী মিছিলের অনেককেই গ্রেপ্তার করল জুন্টা সরকার। এরপর পুলিশ ও দমকল বাহিনীর বেশ কয়েকজনকে জুন্টা আদেশ দিল বিক্ষোভকারীদের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করতে। আমরা যারা এখানে পালিয়ে এসেছি মায়ানমার পুলিশ বিভাগের কর্মী ছিলাম। আমরা গুলি করতে রাজি না-হলে অতঃপর আমাদের ধরপাকড় করতে লাগল তারা। নাগরিক ও অন্যান্য পরিচিতির স্বীকৃতিপত্র কেড়েও নিল। ভিটেমাটি ছেড়ে প্রাণটুকু সম্বল করে পালিয়ে আসতে তাই বাধ্য হয়েছি সীমান্ত পেরিয়ে সপরিবারে এখানে মিজোরামের চম্পাই নদীর এই পশ্চিম পাড়ে। এই অবস্থায় আমরা অনেকে পরিবারের অন্যান্যদের সম্পূর্ণ ফেলে আসতেও বাধ্য হয়েছি। আমাদের অনেক কর্মী পালিয়ে এখানে আসতে পারেনি। কোথায়, কী অবস্থায় তারা আছে জানি না। একথাও শুনছি এখানকার কেউ কেউ আমাদের মায়ানমারে প্রত্যর্পণে আগ্রহী। তাহলে আমাদের নিয়তিতে নির্যাতন এমনকি মৃত্যু অনিবার্য। কে দূর করবে আমাদের ভিটেমাটি, মানমর্যাদা, ভবিষ্যৎ খোয়ানোর অব্যক্ত ভাগ্যহত যন্ত্রণা। কে আমাদের অতীতকে ফিরিয়ে দেবে? ধর্মই কি তাহলে শেষ কথা? জুন্টা সরকার থেরোবদী নন বলেই কি আমাদের খাদ্য, বাসস্থান সামাজিক, আর্থিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষা, ধর্মীয় স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার অধিকার পেতে পারেন? আমরা বুদ্ধের হস্তমুদ্রায় বরাভয় দানের শান্তি-মৈত্রীতেই সর্বদা বিশ্বাসী এখনও। কেন তবে এই দ্বিচারিতা? ব্যাকপ্যাকগুলো থেকে আহার্য পানীয় সব কিছু খুমিরা ওদের অর্পণ করল এবার। বাচ্চা ছেলে-মেয়েগুলো পরম তৃপ্তি সহকারে খেতে শুরু করল। অন্যান্যদের মুখে দেখা দিল কৃতজ্ঞতার অনাবিল অমলিন হাসি।

সন্ধ্যে নেমে আসছে। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ। চারদিক জ্যোৎস্না প্লাবিত। অনেকটা পথ ফিরতে হবে খুমিদের। ওদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে হাঁটতে শুরু করল। ওরাও পেছন পেছন অনেকটা এসে হাত নাড়িয়ে ওদের বিদায় জানাল। বেশ কিছুটা পথ অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ খুমিদের সমবেত চিৎকার ধ্বনিতে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। ওরা যে সেই অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েগুলোই ছুটতে ছুটতে আসছে ওদের দিকে। কাছাকাছি এসেই ওরা খুমিদের প্রত্যেকের হাতে একটা করে বাঁশ ফুলের গোছা তুলে দিয়েই নিমেষে ছুটে দূরে মিলিয়ে গেল। বাঁশ ফুল খুমিরা আগে কেউই দেখেনি, দেখার কথাও নয়। কই তাদের চোখে তো আগে ধরা পড়েনি। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উলটে-পালটে দেখতে লাগল। সোনালি কোনাকৃতি কলার মোচার কাঁদির মতো অংশ থেকে ঠিক যেন ধানের পুরুষ্ট ছড়াগুলোর মতো চারদিকে বেরিয়ে ঝুলছে। বাদামি খোসাওয়ালা ফুলগুলো। ভিতরে সাদা বীজ। তবে কি আবার প্রলয়কাণ্ড সমাগত সকলের জীবনে? নাহ, খুমিরা কেউই এই কুসংস্কারে বিশ্বাস করবে না। স্থির আস্থা তাদের, স্থিতধী, নির্ভীক মুক্ত মনের আগামী প্রজন্ম যে তারা। ছড়াগুলো থেকে বীজ বার করে জমিতে ছড়াতে ছড়াতে তারা এগোতে থাকল নিজেদের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

আজ রাতেই খুমি তার প্রজেক্ট রিপোর্ট শেষ করবে যত রাতই হোক-না-কেন। পরের দিনই সে থাংগা স্যারকে জমা দেবে বাঁশ ফুলের একটা ছড়া তার রিপোর্টটার সঙ্গে গেঁথে। রিপোর্টে সে লিখবেই লিখবে মায়ানমার থেকে আসা অল্পবয়সি ছেলে-মেয়েদের সবাইকে তাদের গভর্নমেন্ট ভেনসাং মেসার্স স্কুলে বিনা স্কুল ফিস ছাড়াই কোনো কালক্ষেপ না-করে ভরতি করার ব্যাপারে। মিড-ডে মিলের সুযোগও যেন তারা পায়। আর দরকার পড়লে তারা নিজেরাই ওদের প্রাইভেট টিউশন করার দায়িত্ব ও নেবে। স্থানীয় সরকারি হাসপাতালে ওদের সকলের জন্য যেন স্বাস্থ্য পরিসেবা দেওয়ার সুপারিশও করেন তার স্কুল কর্তৃপক্ষ।

(বেহালা, কলকাতা-৩৪)

জিজীবিষু

নীতা মণ্ডল

প্রাতর্ভ্রমণ সেরে দিনুর দোকানে চা খেতে খেতে আড্ডা না-মারলে দিনটা যেন শুরুই হয় না অমূল্যর। কত রকমের আলোচনা। পাড়া, শহর, দেশ ছাড়িয়ে একেবারে গোটা দুনিয়ার সমস্যা নিয়ে তর্কাতর্কি। ভারহীন, দায়হীন সব মত বিনিময়। একেবারে নির্ভেজাল বিনোদন।

'যতদিন আছ ভোগ করো। জীবনকে উপভোগ করার আসল সময় তো এটাই। এর আগের জীবন ছিল কলুর বলদের।' বছর দশেক আগে চাকরি থেকে অবসর নেওয়া অমূল্য এখন এমনটাই ভাবে। তাই সে ডাক্তারের পরামর্শকে তেমন গুরুত্ব দেয় না। দরকারে মধুমেহ-অম্লশূল-উচ্চ রক্তচাপকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়। মুঠো মুঠো ওষুধ খেয়েও উৎসব অনুষ্ঠানে কবজি ডুবিয়ে খেতে ছাড়ে না। তার এই ঘটার প্রাতর্ভ্রমণের পেছনেও যে দিনুর চায়ের দোকানের ভূমিকা তার স্বাস্থ্য সচেতনতার চেয়ে অনেক বেশি, তা বলাই বাহুল্য।

মৃদু ছন্দে দৌড়োতে দৌড়োতে শ্রীকান্ত পাল এসে থামল চায়ের দোকানে। পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে ভালোমন্দ খবর নিতে শুরু করল। লোকটার ওই স্বভাব। প্রত্যেকদিন সবার হাঁড়ির খবর নেওয়া চাই। অমূল্যকেই ধরল প্রথমে, 'তোমার মা কেমন আছেন হে?'

অমূল্য হেসে উঠল, 'মা! দিব্যি আছেন, দিব্যি থাকবেন। জীবনে একটা জিনিসের স্বাদ আমি কোনোদিন পাব না, বুঝলে।'

কীসের?

মাতৃশোক।

শ্রীকান্ত থমকে গেলেও অমূল্য থামল না। বলল, 'চিত্রগুপ্তের খাতায় আমার মায়ের নাম লেখা পাতাটাই যে হারিয়ে গিয়েছে ভায়া।'

আড্ডার অভিমুখ ঘোরানোর জন্যেই বোধ হয় নির্মল বলল, 'শুনেছ, চিনে একটা নতুন ভাইরাস এসেছে? কেবল বুড়ো-বুড়িদেরই নাকি ধরছে! সে নিয়ে চিন একেবারে নাস্তানাবুদ।'

শ্রীকান্ত বলল, 'এ নির্ঘাত ওদের কারসাজি। ওদেশে মৃত্যুর হার কম। বেআইনি গবেষণা করে জীবাণু বের করেছে বুড়োদের মারার জন্যে।'

'এ আবার হয় নাকি! বুড়োদের মারতে ছেলেরা জীবাণু বের করবে?' অমূল্য চমকে উঠে বলল, 'ওই ভাইরাস যদি আমাদের দেশেও ঢোকে!'

দুর্গাচরণ বলল, 'এদেশে ও ভাইরাস বাঁচবে না। আমাদের কাবু করা অত সোজা? ছোটোবেলায় পড়নি?

'মন্বন্তরে মরিনি আমরা মহামারি নিয়ে ঘর করি,
বাঁচিয়া গিয়েছি বিধির আশিষে অমৃতের টিকা পরি।'

দুর্গাচরণের অভয়বাণী বিফল প্রমাণিত হতে বেশিদিন লাগল না। মাস না-ঘুরতেই ইটালি, স্পেন, ইংল্যান্ড, আমেরিকার মতো উন্নত দেশসহ সারাপৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর মিছিল শুরু হল। অতি দ্রুত সেই অসুখ ভারতবর্ষেও ঢুকল। অমূল্যদের ছোটো মফস্‌সল শহরে ভাইরাস পৌঁছোনোর আগেই এসে পৌঁছোল আতঙ্ক। সময় থাকতে সে সাবধান হল। সকালে হাঁটা বন্ধ করল। মাস্ক, সাবান আর ভিটামিন ট্যাবলেট কিনল পাহাড় প্রমাণ। পরিস্থিতি আন্দাজ করে ছেলেকে হুকুম দিল চাল, ডাল, তেল, আটা সব দু-তিন মাসের জন্যে মজুত করতে। এমন সময় সরকার ঘোষণা করল, আগামী একুশদিন সব বন্ধ। দেশজুড়ে লকডাউন। যানবাহন চলবে না। স্কুলকলেজে তালা ঝুলবে। বাজার বা আপিস নির্দিষ্ট শর্তে খুলবে। জরুরি কাজ ছাড়া কেউ বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না।

অমূল্য ভয় পেল। যে যা বলল, তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করল। দমাদম থালা বাজল। ব্যালকনি ভরিয়ে দিল মোমবাতিতে। কেবল গোমূত্র পান করাটাই যা বাকি। সেও কোনোদিন করে ফেলবে। নেতারা, সাধুসন্তরা বলছে যখন বিশ্বাস করতে ক্ষতি কী? কথায় বলে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু। তবে ডাক্তারের কথায় ভরসা করাটা বেশি বুদ্ধিমানের। তাই সে সংসারের বাতিল জিনিসের স্তূপ থেকে পুরোনো কেরোসিন স্টোভটা বের করে স্ত্রীকে বলল রান্নাঘর বউমার হাতে দিয়ে তাকে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার নিতে হবে।

অতঃপর অমূল্যর বারান্দায় রোজ সকালে একই দৃশ্য দেখা গেল। ঘুম থেকে উঠেই গরম জলে নুন ফেলে অমূল্য গার্গল করে। তারপর স্ত্রী এগিয়ে দেয় উষ্ণ লেবু-জল। সেটা গিলে ফেলতে-না-ফেলতে চলে আসে আদা, গোলমরিচ,

তেজপাতা, লবঙ্গের কড়া নির্যাস। তারপর তুলসীপাতা। না চিবিয়ে জল দিয়ে ট্যাবলেটের মতো গিলে খায় অমূল্য। শেষে ক-ফোঁটা হোমিয়োপ্যাথি ওষুধ মুখে ফেলে।

বিজ্ঞানীরা বলেছে, ভাইরাসটা শরীরে প্রবেশ করার আগে দু-তিন দিন গলায় আটকে থাকে। গরম জল বা ভাপে সেটি ধ্বংস হয়। জীবাণু ধ্বংসের জন্য সব রকম চেষ্টা অমূল্য করে। চা জলখাবার খেয়ে মাল্টি-ভিটামিন ট্যাবলেট খেতে ভোলে না। এককথায় কবিরাজী, হোমিয়োপ্যাথি বা অ্যালোপ্যাথি কিচ্ছু বাদ দেয় না। অনেক বছর বাঁচতে চায় সে। তাই ভয়ে ভয়ে দিন কাটে। কাটে সপ্তাহ। একুশ দিনের মেয়াদ পেরিয়ে যায়। সংক্রমণের গ্রাফ উর্ধ্বমুখে ধেয়ে চলে। থমকে থাকে মানুষের জীবনযাপনের স্বাভাবিক ছন্দ। রুজিরোজগার হয় অনিশ্চিত। তার আঁচ ধীরে ধীরে অমূল্যর সংসারে এসেও পড়ে।

(২)

বাবার অমতে সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে একদিন হস্তশিল্পের ব্যাবসা ফেঁদেছিল অমূল্যর ছেলে নির্মাল্য। ব্যাবসায় উন্নতি হয়েছে। সেসবই অমূল্য আন্দাজ করেছে দোকানের সাজসজ্জা, ছেলের দিলদরিয়া মেজাজ আর বছর বছর পয়লা বৈশাখের ঘটাপটা দেখে। দু-এক বার লুকিয়ে ব্যাংকের পাসবইও দেখেছে।

এখন নির্মাল্যর পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। কীভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। এই নিয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলতে তার প্রবৃত্তি হয় না। ছোটোবেলা থেকেই বাবার সঙ্গে তার সংঘাত। লোকটা নিজের সুবিধা বা ইচ্ছের বাইরে কারও ইচ্ছের মূল্য দেয় না কোনোদিন।

নিজেকে দূরদর্শী ভেবে যত অহংকার অমূল্যর থাক-না-কেন, ছেলের চোখে সে স্বৈরাচারী। মেয়েদের বিয়ে দিয়েছে তাদের মতামতের পরোয়া না-করে। দেশে পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রি করা টাকা নিজের নামে সঞ্চয় করেছে, বিধবা মায়ের আত্মমর্যাদা বা অধিকারের কথা বিবেচনা না-করে। নির্মাল্য সেসবের প্রতিবাদ করেছে বাপের অবাধ্য হয়ে। ঠিক মতো লেখাপড়া করেনি। চাকরির চেষ্টাও করেনি। অমূল্যও ছেড়ে দেয়নি ছেলেকে। ঠিক দরকারের সময় শুনিয়ে দিয়েছিল, 'নিজের ব্যবস্থা নিজে করবে। নিজের শখে ব্যাবসা করবে! কর গে, আমি কানাকড়িও দেব না।

ধারদেনা করে খেটেখুটে দোকানটা দাঁড় করিয়েছিল নির্মাল্য। বছর পাঁচেকেই দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। পরে দুজন ছেলেকে কাজে রাখতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ছেলে দুটোকে ছাড়িয়ে দিতে বাধ্য হয়েছে সে। দু-মাস দোকান বন্ধ থাকলেও মাইনে দিয়েছে কিন্তু আর সে সামর্থ্য নেই।

'সংসার চালাতে, মেয়ের স্কুলের মাইনে দিতে কি বাবার কাছেই হাত পাততে হবে শেষ পর্যন্ত?' এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে কখন বাড়িতে ঢুকে বারান্দায় উঠেছে নিজেই টের পায়নি নির্মাল্য। সংবিত ফিরে এল বাবার চিৎকারে, 'বাইরে থেকে এসে সোজা বারান্দায় উঠলি যে। আর মাস্কখানা কি ফ্যাশন করার জন্যে পরেছিস? কানে ঝুলছে। নিজের জন্যে না ভাবিস, বুড়ো বাপ-মার কথা ভাববি না? নাকি তারা মরলেই হাড় জুড়োয়? এই অসুখের সময় বাইরে কী কাজ বুঝি না বাপু ...'

নির্মাল্য সাধারণত উচ্চবাচ্য করে না। অমূল্য সারাদিনে ভাববাচ্যে অনেক কথা বলে। কথাগুলো, নির্মাল্য শোনে নাকি এক কান দিয়ে ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করে দেয়, বোঝা যায় না। কিন্তু এখন নির্মাল্য দাঁড়িয়ে পড়ল। স্টোভে একটা কিছু ফুটছে। মা বসে আছে তার সামনে। ওর আট বছরের মেয়েটা ঘুরঘুর করছে দাদুর পায়ে পায়ে। সে দাদুর ভারি নেওটা। বাবার চোখে চোখ রেখে নির্মাল্য চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'খবরদার, তোমার মনের কথা আমার মুখে বসাবে না। বাপ-মা মরলে আমার হাড় জুড়োয়, না? আজন্ম এই বাড়িতে কে নিজের মায়ের মৃত্যু কামনা করে আসছে শুনি? নিজের প্রাণ বাঁচাতে হোমযজ্ঞি শুরু করেছ, ঘরের কোণে পড়ে থাকা বুড়িমার কথা মনে আছে তোমার? আমাকে শেখাচ্ছ বুড়ো মা-বাপের কথা ভাবতে! স্বার্থপর।' বলেই নির্মাল্য পায়ে চপ্পল গলিয়ে আবার বেরিয়ে গেল। অমূল্য ধপ করে বসে পড়ল। স্টোভে বসানো হাঁড়ির জল বাষ্প হয়ে উড়ে যাচ্ছে। সেদিকেই এক মনে তাকিয়ে থাকল অমূল্য। বাষ্পের কুণ্ডলীর ভেতর কেমন করে যেন তার ঝাপসা চেতনা ছবি হয়ে ফুটে উঠতে লাগল।

'কার খুশির জন্যে, কীসের প্রয়োজনে মা বেঁচে আছে এতদিন?' একথা কোনোদিন অমূল্য রাখঢাক করে বলেনি। তার ছেলে-মেয়েরা ছোটো থেকেই দেখেছে মায়ের আয়ু

নিয়ে কেমন নির্মম ঠাট্টা সে করে। তা ছাড়া এ মজা যে আসলে নিষ্ঠুরতা একথা অমূল্য কখনও তলিয়ে ভাবেইনি। ভেবেছে, ছেলে-মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে গেলে, নিজে বৃদ্ধ হলে, সংসারে দায়দায়িত্ব মিটে গেলে মানুষ মারা যাবে এটাই জগতের নিয়ম। নিয়মের ব্যতিক্রম হলেই তো মানুষ হাসিঠাট্টা করে। অমূল্য তাই করেছে।

মায়ের যখন ষাট বছর বয়স, ও গাঁয়ের জমি-বাড়ি বিক্রি করে মাকে নিজের সংসারে নিয়ে এসেছিল। বোনেরা সবাই যে-যার সংসারে থিতু। সবার প্রতি যথাযথ কর্তব্য করে বাবা চলে গিয়েছিল। তারপরও বছর দশেক মা একাই সংসার করেছে। গ্রাম পা রাখতেই লোকের কথায় কান ঝালাপালা হয়ে যেত অমূল্যর। মা জেদ করে একা থাকে আর লোকে তাকে দোষ দেয়। তখনই আরও বেশি করে মনে হয়েছিল, বাবার মতো সময় থাকতে মাও যে কেন মরে গেল না। তা ছাড়া, জনৈক কল্যাণী দীর্ঘকাল বেঁচে থাকলে এই পৃথিবীর কোন্ মঙ্গলটা হবে এও অমূল্যর বোধের বাইরে ছিল।

যে অমূল্য আজ কথায় বলে, 'চাচা আপন পরান বাঁচা', যার কাছে ভারহীন অবসর জীবন শৈশবের মতোই আনন্দের, যার শুধু বাঁচার আনন্দেই বাঁচতে ইচ্ছে করে সে আজ সকাল পর্যন্ত একবারও ভাবেনি, তার মাও শুধু বাঁচার আনন্দেই বাঁচবে, যতদিন না তার স্বাভাবিক মৃত্যু আসছে।

হঠাৎ অমূল্যর মনে হল, 'নির্মাল্য এভাবে কেন বলল? তবে কি নির্মাল্যর কাছে সে পিছুটান ছাড়া আর কিছু নয়? সে মরে গেলে নির্মাল্যর কিচ্ছু এদিক-ওদিক হবে না?'

অমূল্যর শরীরটা কেমন যেন অসাড় হয়ে গেল। অনেকদিন বাদে পা টেনে টেনে মায়ের ঘরে ঢুকল সে। কল্যাণীর ছোট্ট শরীরটা বিছানায় মিশে আছে। গত ছ-মাসে শরীরটা যেন আরও ছোটো হয়ে গিয়েছে। মনে হল, এক অবোধ শিশু অভিমান করে 'আর খেলব না' বলে জগৎ সংসার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আগে এ ঘরে ঢুকেই অমূল্য টিপ্পনি কাটত, 'এমন ঘুমোতে তুমিই পার মা! সবই কপাল, ছেলে-মেয়েদের ভাবনাও ভাবলে না কোনোদিন। ছেলে নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া করল, মেয়েদের বিয়েও আটকে থাকল না। সারাটা জীবন খেলেদেলে আর নিশ্চিন্তে ঘুমোলে।'

আজ অমূল্য সেকথা বলতে পারল না। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মায়ের বিছানার দিকে। ভাবার চেষ্টা করল মা-এর জীবনের কথা। অমূল্য কল্যাণীর প্রথম সন্তান। মা ছেলের বয়সের তফাত কতটুকুই বা, পনেরো কি ষোলো বছর। নিতান্ত বালিকা বয়সেই সে অমূল্যর জন্ম দিয়েছিল। তারপর আরও চার কন্যার। কল্যাণীর কাছে শাশুড়ি আর স্বামীর নির্দেশ ছিল বেদবাক্য। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত নিরলসভাবে সংসারের কাজ করেছে। স্বামী, শাশুড়ি, ছেলে-মেয়েদের মনোরঞ্জন করেছে। বিনিময়ে সামান্য মানমর্যাদা বা স্বীকৃতিটুকুও কি পেয়েছিল কোনোদিন? না সে খোঁজ অমূল্য কখনো রাখেনি। স্বামী মারা যাওয়ার পর ছেলের সংসারে আসতে চায়নি কল্যাণী। সে অনিচ্ছার কথা বিচার না-করেই গ্রামের সম্পত্তি বেচে জোর করে নিয়ে এসেছিল অমূল্য। তারপর প্রায় তিরিশ বছর কেটে গিয়েছে। ঠাকুমার আদরযত্নে অমূল্যর ছেলে-মেয়েরা বড়ো হয়েছে। তারাও একে একে সংসারী হয়েছে। অমূল্য কাজ থেকে অবসর নিয়েছে। কালের ধর্মে জীর্ণ হয়েছে কল্যাণীর শরীর। তার সমসাময়িক মানুষজন সবাই চলে গিয়েছে পরপারে। এতকাল বেঁচে থাকার জন্যে নিজেকে অপরাধী মনে করে সে গুটিয়ে নিয়েছে ঘরের এক কোণে। তবুও আপন সন্তানের ঠাট্টা গরম শলাকার মতো বেঁধে তাকে। তাই সে না-শোনা, না-দেখার ভান করে পড়ে থাকে। দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে পায়ের শব্দে চোখ বুজে ফেলতে সুবিধা হয় তাই সবসময় দেয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে থাকে।

(৩)

আজ কি তবে নির্মাল্য অমূল্যর চোখ খুলে দিল। ভেতরে ভেতরে ছটফট করে উঠল অমূল্য। ভাবল, ভারী অপরাধ হয়ে গিয়েছে। দেরি না-করে এই মুহূর্তেই ক্ষমা চেয়ে নেবে। কল্যাণীর বিছানার দিকে এগোতে এগোতে অমূল্যর মনে হল, মা যেন এক অভিমানী বালিকা। তবে যত অভিমানই করে থাকুক-না-কেন, ঠিক কায়দা করে অভিমান ভেঙে দেব।

মাকে ছুঁতে গিয়ে ডান হাতটা থরথর করে কেঁপে উঠল অমূল্যর। এমন ছেলেমানুষি দুর্বলতার জন্য নিজেকেই মনে মনে ধমকাল সে। তারপর মাকে ছুঁয়েই চমকে উঠে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, মা-এর শরীর যে কাঠের মতো শক্ত আর পাথরের মতো ঠান্ডা!'

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে তার মস্তিষ্কে একটার-পর-

একটা ভাবনার তরঙ্গ খেলে গেল। তার মানে, সকাল থেকে কেউ এই ঘরে ঢোকেনি! নির্মাল্য যে তখন বাইরে থেকে ফিরছিল, এই অসুখবিসুখের সময়, বাইরে পুলিশের পাহারাদারি এর মাঝে ছেলেটা কোথায় গিয়েছিল? কেনই-বা গিয়েছিল? বউমা তো কখনও কর্তব্যে ত্রুটি করে না। নাকি ইদানীং সে আর আগের মতো সকাল-সন্ধ্যে আসে না? ন-টা পেরিয়ে গেল কিন্তু কেউ দেখলই না মানুষটা জেগেছে কিনা, চা খাবে কিনা।

একে একে অমূল্যর স্ত্রী, বউমা নাতনি সবাই এসে ঢুকল ঘরে। বোধ হয় নির্মাল্যকে ফোন করা হয়েছিল, সেও ঢুকল। ব্যস্ত হয়ে একটার-পর-একটা ফোন করছে নির্মাল্য। পাকা ব্যাবসাদার মানুষ। ফোনের মাধ্যমেই একটার-পর-একটা ব্যবস্থা করে চলেছে। অমূল্যর কোনো ভাবনা নেই, নির্মাল্যর ডাকে একদল লোক এখুনি এসে পৌঁছোবে। ছেলে হিসেবে অমূল্য শুধু শেষ কর্তব্যটুকু করবে। মুখে আগুন ছুঁইয়ে বিদায় দেবে মাকে।

'একদল লোক' কথাটা মনে হতেই অমূল্যর মনের আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। কান সজাগ হল। ফোনের এপারে শুধু নির্মাল্যর কথা শুনেই বাকিটা ভেবে নিতে লাগল সে, '... ঘুষঘুষে জ্বর তো মাঝে মধ্যেই হয় ... কাশিটা? সে তো বারোমেসে সঙ্গী ... শীত কমতে কাশি কমে এসেছিল কিন্তু গত দু-তিন দিনে একটু বেড়েছিল ... টেস্ট? করার মতো তেমন কিছু মনে হয়নি ... হঠাৎ কী হল ...'

'তার মানে? সেই মারণ ভাইরাস!' অমূল্য পিছোতে পিছোতে ঘরের এককোনায় সেঁটে গেল। রাগী রাগী চোখে নির্মাল্যর দিকে তাকাল। এখনও কানে ফোন তবে অন্য জনের সঙ্গে কথা হচ্ছে। বোধহয় স্থানীয় কোনো নেতা, '... অ্যাম্বুলেন্স আসবে ... হাসপাতাল হয়ে শ্মশান ... চেনা ডাক্তারদের কেউ বাড়িতে আসতে চাইছেন না ... লোকজন বেশি নেওয়া যাবে না ... পারমিশন নেই তা ছাড়া এখন কেউ যেতেও চাইবে না। ... হ্যাঁ, যত তাড়াতাড়ি হয় মিটিয়ে ফেলব ... আচার-আচরণ বাদ দিতে বলছেন? মুখাগ্নির ব্যাপারে বাবা যা চাইবেন সেটুকু তো করতেই হবে ...'

অ্যাম্বুলেন্স এসে থেমেছে বাড়ির দরজায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা আবরণের ঢাকা ক-জন মানুষ যেন অন্য কোনো দুনিয়া থেকে এসে ঢুকে পড়ল ঘরে। ঘর ভরে গেল রাসায়নিকের গন্ধে। লোকগুলো দ্রুত হাতে গুটিয়ে মুড়ে নিল কল্যাণীর শরীরটাকে। অমূল্যর মাথা বনবন করে ঘুরতে লাগল। লোকগুলো মানুষ নয়, যেন একদল যমদূত। একে একে সবাইকেই ওরকম দুমড়ে-মুচড়ে গুটিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ছুড়ে দেবে শূন্যে। নিজেকে সংযত করতে চোখ বন্ধ করে নিল অমূল্য। সঙ্গে সঙ্গে ঘর জুড়ে ছুটে বেড়াতে লাগল টেনিস বলের মতো গোল গোল কিছু ভয়ংকর জীব। জীব না জীবাণু ঠিক চিনে ফেলল অমূল্য। ঘর জুড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভাইরাস। আঘাত করছে চোখে-মুখে-নাকে-গলায়। ফাঁক পেয়ে ঢুকে পড়ছে মুখ গহ্বরে। গায়ের ছোটো ছোটো কাঁটাগুলো দিয়ে আঁকড়ে ধরছে গলার ভেতরে। তারপর ঢুকে পড়ছে ফুসফুসে শিরায়, ধমনিতে। তার মানে আর কয়েক ঘণ্টা পর আরও একটা অ্যাম্বুলেন্স ঢুকবে, ওরকম প্লাস্টিকে মুড়ে অমূল্যকে বের করে নিয়ে যাবে। ছেলে বলবে, 'তাড়াতাড়ি ঘর ধুয়েমুছে জীবাণু মুক্ত করে দাও ... মুখাগ্নির সংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই ... দেহ নিয়ে চলে যাও ...'

মাস্কটা ভালো করে চারদিকে টেনেটুনে, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে অমূল্য বলল, 'শোনো, মুখাগ্নির সংস্কারে আমার বিশ্বাস নেই। যিনি চলে গেছেন তিনি আর ফিরবেন না। ওরা যখন সব দায়িত্ব নিয়েছে, ওদের হাতেই ছাড়ো। বাড়ির কারও শ্মশানে যাওয়ার অনুমতির জন্যে ঝুলোঝুলি করতে হবে না। বডি বের হলে ঘর যত তাড়াতাড়ি স্যানিটাইজ করা যায়, সেই ব্যবস্থা করো।'

কথা ক-টা বলেই অমূল্য ঢুকে গেল বাথরুমে। হাতে তুলে নিল জীবাণু ধ্বংসকারী সাবান। চামড়ার উপর ঘষতে লাগল। ঘষেই গেল।

(হায়দরাবাদ, তেলেঙ্গানা)

সমাধান শব্দ তরঙ্গ - ২

উপর-নীচ		পাশাপাশি	
১।	তদারক	১।	তলব
২।	বদন	৩।	দর
৫।	জলদ	৪।	রজন
৭।	রশিদ	৬।	দরবার
৯।	রমজান	৮।	দমন
১০।	নবাব	১১।	রজনি
১২।	জনক	১৪।	কাঁকন
১৩।	নীল নয়ণা	১৫।	শবর
১৫।	শশা	১৭।	শারদ
১৬।	ধীবর		

মাস্টারমশাই

মৃত্যুঞ্জয় দেবনাথ

মাস্টারমশাই হয়েছেন বটে, তবে স্বপ্নপূরণ হয়নি। এমন ভাবনাই মাথায় ঘোরে সর্বদা ভূদেববাবুর। বস্তুত, তেমন ছাত্র তৈরি করার সুযোগও-বা পেলেন কই? অর্থ রোজগার এই প্রফেশনে মুখ্য নয়। তাই, রিটায়ারমেন্টের পরও আক্ষেপ যায় না তার।

এ পথটা তুলনায় শর্টকাট। তিন মিনিট আগে ঢোকা যায় স্কুলে। তবু, নিতান্ত বাধ্য না-হলে এপথ মাড়ান না ভূদেব। আজও চাননি। বেরোতে দেরি হয়ে গেল, তাই-। একটা বাথরুম হওয়ার এই জ্বালা। সে-তুলনায় আগের ফ্ল্যাটটাই ভালো ছিল। আয়তনে সামান্য ছোটো ছিল-এই যা। কিন্তু ডাবল বাথরুম। এমনটাই এখনকার ফ্যাশন। অনায়াসেই নিতাইবাবু এখানেও করে দিতে পারতেন যদিও দুটি। ভাবলেন, বারান্দাটা ছোটো হয়ে যাবে তাতে। এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন, এক টুকরো বারান্দার চাইতে ডাবল বাথরুম কত বেশি জরুরি।

একটা সংগত কারণও রয়েছে পথটা না-মাড়ানোর ভূদেববাবুর। আস্ত একটা বস্তির ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে বেরিয়েছে পথটা। সরু গলি। উপরি, দু-পাশে ছড়ানো থাকে সবসময় নোংরা- আবর্জনার তাল। সঙ্গে কুকুর-বেড়ালের মলমূত্র। কখনও আদুর গায়ে সদাসর্বদা হইহই করে বেড়ানো মনুষ্যছানাপোনাগুলির পটি। ওয়াক! কথায় কথায় রুমাল জড়াতে হয় নাকে। তেমনি গঙ্গাফড়িঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে এগোতে হয় প্রায় গোটা পথটা।

যদিও এটিই একমাত্র কারণ নয়। প্রধান কারণটি অন্য। এই বস্তি পাড়ার ছেলে-মেয়েগুলির অধিকাংশ ভূদেববাবুর দীপবাণী বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। এছাড়াও আধবুড়ো ফুলবুড়োদের অনেকেই এক্সস্টুডেন্ট। রোজ রোজ এদের মুখোমুখি হতে ভালো লাগে না তত। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করেন ভূদেব। মনে মনে লজ্জিতও হন অল্পবিস্তর। ভাবেন, হায় রে। এই না-হলেন মানুষ গড়ার কারিগর। গড়তে পারলেন কই সেই মতো একটিকেও? এখানকার কেউ ভ্যানচালক, কেউ রিকশাপ্যাডলার; কেউ সবজিওলা, মাছওলা। কেউ-বা চপার। দিবারাত্র জবাই করে চলেছে মুরগি-ছাগল। আর সবারই ঠোঁটে সদা প্রজ্জ্বলিত বিড়ি-সিগারেট। নয় ঠোঁটের নীচে খইনি। মুখে চুটকি-রজনিগন্ধা। মুখোমুখি হয়ে গেলে রক্ষা নেই, লজ্জায় মুখ লুকোতে হয় নিজেকেই। আর সেবন করতে করতেই এগোতে হয় জলজ্যান্ত বায়বীয় নেশার দুর্গন্ধ।

রাস্তাটা বাঁক নিতেই ছেলেটার সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল।

বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেল ছেলেটাই। অথচ দরকারও ছিল না তার। কেন-না, ভূদেব স্যার চিনতে পারেননি তাকে। 'মালিকা পরিলে গলে প্রতি ফুল কে বা মনে রাখে?' তবু, ঠোঁট থেকে বিড়িটা ধাঁ-করে মাটিতে ফেলতেই চোখে পড়ে গেল আরও বেশি করে। হয়তো অনুমানই সত্য হবে ভূদেব স্যারের। ওর নাম রুনু। ভালো নাম রঞ্জন।

ভালো আছেন স্যার? চিনতে পারছেন আমায়? প্রণাম করল ও।

ভূদেব স্যার ওর মাথায় আশীর্বাদের হাত বুলিয়ে বললেন, কেন চিনব না? একটু হয়তো সময় লাগল এই বলতে পারিস। তোরা তো আমাদের ছেলে-মেয়ের মতো। নিজ সন্তানদেরও কেউ ভোলে? রুনু তো?

রঞ্জন মাথা নাড়ে। মুচকি হাসে।

কী করছিস এখন বাবা?

গাড়ি চালাচ্ছি একটা। টাটা সুমো। লাগলে বলবেন স্যার। ভাড়ার কথা ভাববেন না।

সেদিন কখন, কেমন করে দুর্ঘটনাটি ঘটে গেল, টের করতে পারেননি ভূদেব স্যার নিজেও। রিকশো থেকে নেমে বাজারের ব্যাগটা আঙুলের ডগায় চড়িয়ে মাছের দোকানের সামনে এসে একটু ঝুঁকে দাঁড়িয়েছেন সবে। লক্ষ করলেন, তিন মাছওয়ালি বউ-এর পাশে আজ নতুন এক ছোকরার আমদানি হয়েছে। ছোকরা মানে, সেও বছর ত্রিশ-বত্রিশের হবে। আচমকা কথা বলে উঠল ছেলেটি।

একটা ইলিশ নিয়ে যান, স্যার। পদ্মার। জলজ্যান্ত। কান উপড়ে টকটকে লাল কানকো দেখায় ও। ভূদেববাবু গা করলেন না তত। বললেন, না বাছা, আজ চারাপোনা নেব। অনেক দিন জ্যান্ত খাইনি। সে আপনি কালও পেয়ে যাবেন, কিন্তু এটি আর নাও মিলতে পারে, স্যার। নিন না। কম করেই দিচ্ছি। এতবার স্যার স্যার শুনেই অনুমান করলেন ভূদেববাবু, পুরোনো ছাত্রটাত্রই হবে নিশ্চয়ই। ওই মুহূর্তে চিনে উঠতে পারছেন না হয়তো।

সত্যিই তাই। ছেলেটি বলে উঠল, আমাকে চিনতে পারছেন না, স্যার? আমি বিশু। বিশ্বদেব পাল। দু-হাজার দুইয়ের মাধ্যমিক ব্যাচ। আপনি আমার নাম দিয়েছিলেন 'বিলে।'

অমনি চোখের সামনে বিস্মৃতপ্রায় একটি মুখ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। আশ্চর্য! ও বিলে? যার কিনা বইয়ের ব্যাগে সদা সর্বদা 'রামকৃষ্ণ কথামৃত' থাকত। একদিন অনেক বড়ো হবে, যার স্বপ্ন ছিল। যে বিবেকানন্দকে নিয়ে কবিতা লিখত। তার কোটেশনগুলি অনর্গল মুখস্থ বলে যেত।

আপ্লুত হয়ে পড়লেন ভূদেববাবু। খানিক মন খারাপও। ভাবতে থাকেন, কই আর বড়ো হতে পারল এরা? কেন-বা এমন হয়? কোথায় গলদ ছিল তবে? ছেলে-মেয়েদের ইচ্ছাশক্তির, নাকি স্যার-আন্টিদের উৎসাহ অনুপ্রেরণার? বন্ধুর পথের চড়াই উতরাই পেরিয়ে টগবগ করে ছুটে চলার মন্ত্র সত্যিই শেখাতে পেরেছেন তারা এদের? চূড়ান্ত ব্যর্থ নন বুঝি এই একটি জায়গাতেই?

নিয়মশৃঙ্খলাহীন অখ্যাত একটা স্কুলে আজীবন শিক্ষকতা করে এলেন-ভেবে আক্ষেপ করেন ভূদেব স্যার।

পুরোনো কথা মনে পড়ে যায় অমনি। সেই কোনকালের কথা। স্কুলের প্রধানশিক্ষক তখন উমেশবাবু। ন্যায়নিষ্ঠ, স্কুল-অন্ত প্রাণ মানুষ। নিজের হাতে গড়ে তুলেছিলেন প্রতিষ্ঠানটিকে। ছাত্রছাত্রীদের ভিড়ে গমগম করত তখন স্কুলবাড়ি। উনি মারা যেতে সব শেষ। এক অরাজক পরিস্থিতি নেমে এল ক্রমে। কোথায় উধাও হয়ে গেল পাংচুয়ালিটি, ডিসিপ্লিন, সিনসিয়ারিটি ইত্যাদি শব্দগুলো। ফিরিয়ে আনারও উদ্যোগ নিল না আর কেউ! কেউ না! একটা বড়ো ইলিশ নিয়ে ব্যাগে পুরেছিলেন, এই অবধি মনে আছে ভূদেববাবুর। তারপর আর কিচ্ছু মনে নেই। মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠেছিল অমনি। চোখ-মুখ অন্ধকার। বুকের ভেতরটায় কোনো কষ্ট।

জ্ঞান ফেরার পর চারদিকে দু-চোখ বুলিয়ে অবাক হলেন ভূদেববাবু।

এ কোথায় শুয়ে আছেন তিনি? আশ্চর্য। এ তো হাসপাতাল। কী হয়েছিল তার? কে এনে ভরতি করে দিয়ে গেল এখানে তাকে? কারা?

আলপনার দিকে তাকালেন উনি। মাথার পাশে বসে আছে ও। বড়ো ক্লান্ত-বিধ্বস্ত মুখ ওর। সর্বাঙ্গে ঝড়ের ঝাপট। মুখময় যুদ্ধের কালিমা।

আলপনা কোমল হাত বোলাল ভূদেববাবুর কপালে। অস্পষ্ট স্বরে বলল, আরও একটু ঘুমোও। ডাক্তারবাবুরা বিশ্রাম নিতে বললেন।

কী হয়েছে আমার? কে আনল এখানে? কেমন করে -

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন ভূদেববাবু। ইশারায় থামাল আলপনা। এখন নয়। সুস্থ হয়ে ওঠো, সব বলব। চারদিন ধরে ঝড় বয়ে গেছে আলপনার উপরে। আঁচ লাগেনি তবু তেমন শরীরে। সবটাই শামাল দিয়েছে ভূদেববাবুর পুরোনো ছাত্ররা। পেছনের বস্তিপাড়ার বাসিন্দা সবাই। কারোর নাম বলতে পারেনি আলপনা, তবে খানিক আন্দাজ করতে পারছিলেন ভূদেববাবু নিজে। মনে মনে ভাবলেন, বাব্বা। স্যারের জন্য...

রঞ্জন এল পরদিন। সঙ্গে গোপাল। ওর মুখটাও ভুলে গেছিলেন প্রায়। হঠাৎ মনে পড়ে গেল। নিজেই বলে উঠলেন, তুই গোপাল না?

গোপাল মাথা নাড়াল। স্যারের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

ভূদেববাবু বললেন, বড়ো দুষ্টু ছিলিস। এখন কী করছিস বাবা?

গোপাল হাসে। একটা দোকান নিয়েছি স্যার। বড়ো রাস্তার মুখে। সকাল-বিকেল করে চা বানাই। সঙ্গে ঘুগনি-রুটি।

বেশ বেশ, উন্নতি কর্ বাবা। কাজের কোনো ছোটো-বড়ো নেই। সৎভাবে লড়াই করে মাথা তুলে দাঁড়ানোটাই বড়ো কথা।

আলপনা বলল, এরাই সব ব্যবস্থা করেছিল সেদিন।

হাসি হাসি মুখ করে তাকান ভূদেববাবু ওদের দিকে। বড়ো ভালো ছেলে ওরা। স্যারকে এখনও মনে রেখেছে। টাকা নিতে চাইছিল না কিছুতে রঞ্জন, জোর করলেন ভূদেববাবু। কেন নিবি না? বিপদের সময় পাশে দাঁড়িয়েছিস, সেই তো সবচেয়ে মূল্যবান! তার দাম কি দিচ্ছি তোকে? নাকি দেওয়া যায় তা কখনও?

সন্ধ্যেবেলা অনেকেই এল। বিলেও। ওর হাতে একঠোঙা মাছ। জ্যান্ত কইমাছ স্যার। এখন আপনার খুব কাজে দেবে এটা। অসুস্থ শরীরে এসব মাছই খেতে বলেন ডাক্তাররা। একটু থেমে আরও বলল ও। এবার থেকে আর বাজার যেতে হবে না আপনাকে, আমিই এসে দিয়ে যাব খন। কোন্‌দিন কী মাছ লাগবে, বলে দেবেন।

রিন্টু এসেছিল রাতে।

ভারী কর্মঠ ছেলে। তেমনি সৎ। একটা পান দোকান চালায় মোড়ের মাথায়। ডাক পড়লে ফিজিয়োথ্যারাপি। ক-জন নির্দিষ্ট পেশেন্ট পেয়েছে ইদানীং। লেখার বাতিকও আছে ওর। ভালো লেখে। গল্প-কবিতা, এইসব। বেরোয় অনেক বড়ো বড়ো পত্রিকায়। এর মধ্যে নেতাজি ওপেন ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স কমপ্লিট করল ও। ওকে যত দেখেন-তত অবাক হন ভূদেববাবু। এত্ত প্রাণশক্তিও থাকতে পারে কারোর ভিতর? স্ট্রেঞ্জ।

কেমন আছেন স্যার, বলুন? ভালো বোধ করছেন তো এখন? হেসে বলল রিন্টু।

ভালো আছি। পরে আলপনার কাছে শুনেছেন, ও-ই ফোনে ফোনে যোগাযোগ করে হাসপাতালে ভরতির ব্যবস্থা করেছে। রিন্টুর দিকে তাকালে কেমন গর্ব হয় ভূদেববাবুর। ওনার ছাত্র নয় ও। পড়াননি কোনোদিনও। 'স্যার' বলে ডেকে উঠলেই তবু আমজাদ আলির সরোদ বেজে ওঠে বুকের ভেতরটায়।

একটু সুস্থ হয়ে উঠতেই আলপনাকে কথাটা পাড়লেন ভূদেববাবু।

খুব কি মন্দ হবে বিষয়টা? স্কুলজীবনে তো পারলাম না কিছু করতে, এখন যদি। উৎসাহ, অনুপ্রেরণাটাই এদের জীবনের মুখ্য, যা থেকে বঞ্চিত এরা, চিরকাল।

আলপনা সম্মতি জানিয়ে মাথা দোলায়। করোই না তবে, শরীরটাও ভালো থাকবে।

রাতে বালিশে মাথা রেখে কল্পনার দৃষ্টিতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন ভূদেববাবু বস্তিপাড়ার একদঙ্গল ছানাপোনায় থিকথিক করছে তার ঘর-বারান্দা। ওদের সকলের হাতে বই খাতা, পেন পেনসিল। দু-চোখে উচ্চাশার আলো। পরম আগ্রহে তাদের স্বপ্ন দেখা শেখাচ্ছেন তিনি।

(স্বামীজি সড়ক, বেহালা, কলকাতা)

অন্য অনুভূতি
দিপালী বৈদ্য

বিয়েটা সুনন্দা করেই ফেলল। করবে নাই-বা কেন। এত ভালো ছেলে, বাড়ির সবাই তো এটাই চায়। পাড়ার শিক্ষক কাকুই প্রথম মাকে এসে প্রস্তাবটি দিয়ে বলেছিল 'ভালো বাড়ি, সরকারি চাকুরে, এই রকম ছেলে সুনন্দার জন্য খুঁজেও পাওয়া যাবে না। তুমি এই বিয়েতে রাজি হয়ে যাও বউদি।' মা আর অমত করতে পারেনি।

সুনন্দা-সুন্দরী, শিক্ষিতা, আধুনিকা মেয়ে। মনোরথ তাকে প্রথম দেখেছিল সুনন্দাদের পাড়ার এক অনুষ্ঠানে। প্রথম দেখাতেই মনোরথের ভালো লেগেছিল তাকে। কিন্তু সাহস করে তার মনের কথা সুনন্দাকে বলতে পারেনি। তাই একেবারে নিজের শিক্ষককেই ঘটক করে পাত্রীর বাড়ি হাজির করেছিল।

কথাগুলো ভাবতে ভাবতে সুচেতা একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মেয়ের ডাকে চমকে উঠল। পাঁচশো পঞ্চাশ স্কোয়ার ফুটের ফ্ল্যাটটার নিস্তব্ধতা ভেঙে গম গম করে তার মেয়ের গলার আওয়াজই বারবার প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এতক্ষণে মেয়ে রান্নাঘরে এসে হাজির। 'ভাতটা দাও আমারতো দেরি হয়ে যাচ্ছে।' তাইতো সেদিকে সুচেতার খেয়ালই নেই। এই আজকের দিনটা এলেই সেই পুরোনো সব ঘটনা তার আশেপাশে ছবির মতো ঘুরে বেড়ায়। টেবিলে ভাত দিয়েছি, খেয়ে নে। সবকিছু গুছিয়ে নিয়েছিস তো? এখুনি বাস এসে যাবে। সত্যি মেয়েটা টিফিনটা নিতে প্রতিদিন ভুলে যায়। টিফিনের বাক্সটা মেয়ের ব্যাগের মধ্যে দিয়ে সুচেতা মেয়েকে বাসে তুলে দিয়ে আসে।

দু-দিন হল কাজের মেয়েটা আসছে না। এখন সে বাড়িতে একা। সারা ফ্ল্যাটটা জুড়ে এখন শুধুই নিস্তব্ধতা। সুচেতার স্বামী সুপ্রকাশ সেই সকালে অফিস বেরিয়ে গেছে। স্বামী আর মেয়েকে নিয়ে তার সুখের সংসার। ঘরে ফিরে সুচেতা ড্রইং রুমের পূর্বদিকের দেয়ালে টাঙানো ছবিটার কাছে এসে দাঁড়ায়। শাড়ির আঁচল দিয়ে ছবির উপর আলতো করে মুছে নেয় সে। 'বা! ছবিটা খুব সুন্দর, সুনন্দার মেয়ের মুখে-ভাতে তোলা ছবি। কী সুন্দর দেখাচ্ছে সুনন্দাকে।' সে কথাগুলো মনে মনে বলতে থাকে।

দু-বছর আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো তার মনের মাঝে ভিড় করতে থাকে। হাসপাতালের বেডে শুয়ে সুনন্দা বলেছিল 'দিদি হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ হলে তোর বাড়িতে গিয়ে থাকব।' সুচেতা বোনের ফুলে ওঠা দগ্ধ মুখটার দিকে তাকিয়ে চোখের জল ধরে রাখতে পারেনি। 'থাকিস, আগে তো সুস্থ হয়ে ওঠ্।' সুনন্দা দিদির কথাশুনে নিশ্চিন্তে চোখ বুজিয়েছিল। এই চোখ বোজা চিরকালের মতো তা সুচেতা ভাবতেও পারেনি। তবে ডাক্তার বলেই ছিল, ওকে আর বাড়ি ফেরানো যাবে না। শরীরের নব্বই শতাংশই পুড়ে গেছে। বাঁচার কোনো আশা নেই।

মানুষের মন বড়ই বিচিত্র, আজ যা ভালো লাগে কাল তা নয়। দুজনে তো এ বিয়েতে রাজি ছিল। তাহলে কেনই-বা এমন পরিণতি। শুধু কি শাশুড়ির গঞ্জনা না কি আরও অন্য কিছু যেটা ওকে এতবড় ডিসিশন নিতে বাধ্য করেছিল। আজ মনে হয় সেদিন মনোরথকে তার প্রাপ্য শাস্তিটা দেওয়া উচিত ছিল। ওই ছোট্ট মেয়েটার মুখের দিকে তাকিয়েই তো আমরা মুখ বন্ধ করে নিয়েছিলাম।

সুনন্দা মারা যাওয়ার ছ-মাসের মধ্যে মনোরথ বিয়ে করল। তবে কি সুনন্দার আত্মহত্যার পিছনে এটাই বড়ো কারণ। মেয়েটা তো কোনোদিন ওর মনের কথা বলেনি। সেদিন মা ওর বাড়িতেই ছিল। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর মায়ের পাশেই শুয়েছিল সে। কখন পাশ থেকে উঠে বাথরুমে ...। ও হ হ ভাবলেই গা শিউরে ওঠে সুচেতার। মেয়েটা এত বড়ো ঘটনা ঘটাল মুখে টুঁশব্দটি করল না। সুচেতার বুকের ভিতরটা দুঃখে-কষ্টে মুচড়ে ওঠে। তার দু-গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে জানালা দিয়ে বাইরে তাকায় সে। দূরে ওই পাকুড় গাছটায় বসে একটা কাক ডেকেই চলেছে। আজ বড্ড গরম, রাস্তাঘাট শুনসান। মাঝে মাঝে দু-একটা গাড়ি ছাড়া রাস্তায় কোনো জনমানবের দেখা নেই।

দুটো বছর সুচেতার কোনো কাজে মন নেই। দেখতে দেখতে দুটো বছর কেটে গেল। এই দিনেই সুনন্দা তাদের ছেড়ে চলে গেছে। টেবিলের উপর রাখা জলের বোতলটা তুলে নেয় সে। প্রচণ্ড গরমে বোতলের জলটাও গরম হয়ে গেছে।

অনেক বেলা হয়ে গেছে। ও মা দুটো তো বেজে গেল বলতে বলতে সুচেতা বেডরুমে গিয়ে ঢোকে। মোটা পুরু পর্দায় ঢাকা জানালাগুলো থেকে হালকা ক্ষীণ আলো ঘরে এসে পড়েছে। বিছানার উপর কালো রঙের ওটা কি? ওমা এ যে একটা কালো বিড়াল বিছানায় বসে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। বেড়ালটা এল কোথা থেকে। হুস ... যা ... যা ...। বিড়ালটার তাতে কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। একইভাবে বসে আছে। এর আগে তো কখনও আশেপাশে বিড়ালটাকে দেখেনি সে। সুচেতা এক দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরের পাশে রাখা লাঠিটা নিয়ে বেডরুমে ঢোকে। তখনও বিড়ালটা তার বিছানার উপর একইভাবে বসে। সুচেতা রাগে চেঁচিয়ে ওঠে। 'তবে রে, আর জায়গা পেলি না একেবারে খাটের উপর, এখুনি নাম।' এবার সে এক লাফে জানলার কাছে চলে আসে। সুচেতা পর্দা সরিয়ে বিড়ালটাকে খুঁজতে থাকে। না আর দেখা পাওয়া গেল না। শুধু টানটান করে পাতা বিছানার চাদরটায় তার পায়ের ছাপটুকু পড়ে আছে। সুচেতা বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। কী ভেবে তার সারাশরীরে তড়িৎ খেলে যায়। বিছানার উপর সে ধুপ করে বসে পড়ে। তখনও তার হাত থেকে লাঠিটা মেঝেতে পড়ে একটানা আওয়াজ করে চলেছে।

(বেহালা, কলকাতা)

যুদ্ধ
শ্রাবণী চক্রবর্তী

পৌষের সকাল। আকাশ মেঘে ভার হয়ে আছে। শুরু হল অঝোরে বৃষ্টি। বৃষ্টি নামে বিশ্বনাথের চোখেও। মনের আকাশে জমে থাকা মেঘ বৃষ্টি হয়ে নামছে অশ্রু হয়ে। হাসপাতালের বহির্বিভাগে বসে আছে বিশ্বনাথ। অনেক শখ করে মেয়ের নাম রেখেছিল কল্যাণী। কিন্তু মাত্র একুশ বছরে এক মারণ জ্বরে কল্যাণী চলে যাবে বাবা, মা, আত্মীয়-পরিজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে ছেড়ে। বিষ্যুদবারে জন্মেছিল মেয়েটা, তাই মা নাম রেখেছিল কল্যাণী। সত্যিই কল্যাণী জন্মানোর পরে সংসারেও বাড়বাড়ন্ত দেখা দিল। ভাগ-চাষি বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে পয়সা জমিয়ে তারপর স্বনিযুক্তি প্রকল্পে টাকা পেয়ে একটা অটোরিকশা কিনেছিল। তারপর দু-বছর বাদে আরও একটা অটোরিকশা কিনেছিল। একটা বিশ্বনাথ চালায়, আর-একটা ভাড়ায় খাটায়। সেই কল্যাণী প্রতিমা বুঝি বিসর্জনের পথে। আসন্ন বিয়োগ বেদনায় বুঝি প্রকৃতিও কাঁদছে, তাই বৃষ্টি। পৌষে অকাল বৃষ্টি। কল্যাণীর প্রাণটাও বুঝি অকালে ঝরে পড়বে।

ডাক্তাররাও হতাশ। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে প্রথমে জেলা হাসপাতাল। তারপর সেখান থেকে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভরতি হল কল্যাণী মাজি। কিন্তু ডাক্তারদের সব চেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছিল। সারা শরীরের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিকলের পথে, মস্তিষ্কও সাড়া দিচ্ছিল না। শেষ চেষ্টা হিসেবে ডাক্তাররা কল্যাণীকে আইসিসিইউতে স্থানান্তরিত করলেন। লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমের সাহায্যে কোনো মতে প্রাণটুকু রয়েছে কল্যাণীর। তবে তাঁরা কোনো আশার কথা শোনাতে পারেননি বিশ্বনাথকে। ডাক্তারদের সঙ্গে বিশ্বনাথও অপেক্ষা করছে আশ্চর্য কিছু হওয়ার আশায়। আশঙ্কায় বুক কাঁপে বিশ্বনাথের। কলেজে পড়া মেয়ের বড়ো শখ পড়াশোনা করবে, তারপর স্কুলে শিক্ষকতা করবে কিন্তু সেই স্বপ্ন বুঝি অধরাই থেকে যাবে! কাঁদতে কাঁদতে ভাবে বিশ্বনাথ 'কি অন্যায় করেছি যে আমাকে ও আর বাবা বলে ডাকবেনা?'

(২)

ডাক্তার রত্নাশীষ সেন ক্লাস শেষে নিজের কেবিনে বসে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎ মোবাইলটা বেজে উঠল। 'হ্যালো, ড. সেন বলছেন?' 'হ্যাঁ বলছি।'

'আমি ড. চন্দন রায় বলছি। আপনি একটু দয়া করে মেডিসিন ওয়ার্ডের আইসিসিইউতে আসতে পারবেন? একটা ক্রিটিকাল পেশেন্ট আছে। ডেঙ্গুর রোগী, মাল্টিপল অরগ্যান ফেলিওর হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আপনি তো ব্রেনের কাজ নিয়ে গবেষণা করছেন, দেখুন শেষ চেষ্টা করে যদি কিছু করতে পারেন। আপনিই এখন ভরসা। তাই আপনাকে আসতে অনুরোধ করছি।'

'ঠিক আছে। আমি দশ মিনিট বাদে যাচ্ছি।'

বিখ্যাত স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ ড. রত্নাশীষ সেন বহুদিন বেঙ্গালুরুতে সরকারি হাসপাতালে ছিলেন। মস্তিষ্কের উপর নানা গবেষণা করেছেন। স্বীকৃতি পেয়েছেন। বিদেশি স্বীকৃতির শিরোপা অর্জন করেছেন। কলকাতায় এসেছেন, নিজের শহরে কাজ করবেন। কয়েক বছরের চুক্তিতে আছেন কলকাতা মেডিকেল কলেজে। তাঁর নবতম কাজ মিউজিক থেরাপি দ্বারা মস্তিষ্কের কোষের পুনর্জাগরণ। এই কাজে সাফল্যও পাচ্ছেন। তাই বুঝি ড. রায় ডাকছেন তাঁকে। চা শেষ করে ছুটলেন মেডিসিন ওয়ার্ডের আইসিসিইউ-এর দিকে। ড. চন্দন রায় অপেক্ষা করছিলেন, নিয়ে গেলেন কল্যাণীর শয্যার পাশে। ভেন্টিলেশনে থাকা কল্যাণীর শীর্ণ চেহারা, ফোলা ফোলা হাত-পা দেখে ড. সেনের বুকের ভিতরটা যেন মুচড়ে উঠল, 'আহারে! ফুলের কুড়ি প্রস্ফুটিত হতে-না-হতেই ঝরে যাচ্ছে! আমাদের কোনো ক্ষমতাই কি নেই মেয়েটিকে যাতে জীবনের পথে ফিরিয়ে আনতে পারি?' ভাবতে ভাবতে ড. সেন বলে উঠলেন, 'Let us take a challenge!' আশার আলোয় ড. চন্দন রায়ের মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করে মানুষকে বাঁচানোই তো ডাক্তারদের কাজ।

'ড. রায়, আমাকে রোগীর কেস হিস্ট্রিটা দেখান, ডিটেলসগুলো আমি দেখতে চাই।' ড. সেনের ডাকে চমক ভাঙল ড. রায়ের।

'হ্যাঁ, আসুন, দেখাচ্ছি।'

'মেডিকেল বোর্ডে যাঁরা আছেন সেই সব ডাক্তার,

মেট্রন সবাইকে ডাকুন আধঘণ্টা বাদে। একটা দলগতভাবে কাজ না-করলে চ্যালেঞ্জ আমরা জিততে পারব না,' বলে ড. সেন মনোযোগ দিলেন কল্যাণীর বিভিন্ন শারীরিক রিপোর্টে।

'শুনুন, আমরা যদি দলগতভাবে এক মানুষের মতো কাজ না-করি তাহলে মৃত্যুপথযাত্রী কল্যাণীকে বাঁচাতে পারব না। আমার নেতৃত্বে কাজটি হবে। কারুর দ্বিমত থাকলে আমায় বলবেন। কিন্তু কাজ যা করতে বলা হবে তা বাদ দিয়ে নয়। কারণ, আমার চিকিৎসা পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা অনুসারী নয়। আমার পদ্ধতিতে আপনাদের দ্বিমত থাকতে পারে, সেই বিষয়ে আপনাদের আমি বুঝিয়ে বলব। চিকিৎসাশাস্ত্র মতে যা করণীয় সবই আপনারা করেছেন। কিন্তু যেভাবে রুগীর মালটিপল অর্গান ফেলিওর শুরু হয়েছে তাতে বেশিদিন কৃত্রিমভাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। ব্রেন ডেথ হয়ে গেলে আমাদের আর কিছু করার থাকবে না। আমরা কাল সকাল থেকে শুরু করব 'মিউজিক থেরাপি।' প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছ-টায় কল্যাণীকে হেড-ফোনে শাস্ত্রীয় সংগীত শোনানো হবে আধ ঘণ্টা করে। ওই আধঘণ্টায় দেখতে হবে শরীরের তাপমাত্রা বাড়ছে কিনা। প্রেসার, পালস, হার্টের গতি, স্নায়ুর সাড়া পাওয়া যাচ্ছে কিনা।' ড. সেনকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন ড. অনুপ গাঙ্গুলী, স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ, 'স্যার, রুগী কোমায় আছে। কি করে শাস্ত্রীয় সংগীত শুনতে পাবে?'

'এটাই তো আমার নতুন গবেষণা, নতুন চ্যালেঞ্জ। দেখুন না, কল্যাণীর ভাগ্যবিধাতার সঙ্গে লড়াইয়ে আমরা জিতি কিনা। চেষ্টা তো একটা করতেই হবে।'

ড. গাঙ্গুলীকে জবাব দিয়ে আবার বলতে শুরু করলেন ড. সেন, 'ওই সময় সমস্ত রিপোর্ট যে-যে ডাক্তার দায়িত্বে থাকবেন, লিখবেন আর সকলের রিপোর্ট আধঘণ্টা বাদে একজন দায়িত্বশীল অভিজ্ঞ নার্স রোগীর ফাইলে লিখে রাখবেন। আমি প্রতিদিনের রিপোর্ট দেখব। হ্যাঁ, প্রথম দিকে আমি নিজে থাকব। কোন্ দিন কোন্ রাগের শাস্ত্রীয় সংগীত শোনানো হবে তা আমি ঠিক করে দেব। তবে হ্যাঁ, প্রথম দিনেই ফল আশা করবেন না। ফল পেতে ধৈর্যের সঙ্গে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। ড. রায়, আপনি দায়িত্ব ভাগ করে দেবেন। আপনাদের যুদ্ধে এখন আমিও একজন সৈনিক।'

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন ড. রায় ড. সেনের কথা, বলে উঠলেন, 'না, না, স্যার। আপনি আমাদের সেনাপতি।'

'আচ্ছা, চলি তাহলে। কাল সকাল ছ-টায় দেখা হচ্ছে' বলে আত্মপ্রত্যয়ের দৃপ্ত ভঙ্গিতে বেরিয়ে গেলেন ড. রত্নাশীষ সেন। উপস্থিত ডাক্তার, নার্সদের চোখে আশার আলো চিক চিক করছে। যতই মানুষ ওঁদের ভুল বুঝুক ওঁরা ড. নর্মান বেথুন, ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলকে আদর্শ মনে করেন।

(৩)

সকাল সাড়ে ছ-টা — ড. সেন কল্যাণীর কানে হেড-ফোন লাগিয়ে শাস্ত্রীয় সংগীতের সুর চালিয়ে দিলেন। সবাই রুদ্ধশ্বাসে মনিটরের দিকে তাকিয়ে। স্নায়ুর সঞ্চার শুরু হল কিনা আধঘণ্টা বাদে দেখবেন ড. গাঙ্গুলী। ঘড়ির কাঁটা ঘুরতে থাকে। সবাই নিস্তব্ধ। প্রত্যেকেই যেন নিজেদের হৃৎস্পন্দন শুনতে পাচ্ছেন। আধঘণ্টা শেষ হল। হতাশার ছায়া নেমে এল সবার মুখে শুধু ড. সেন ছাড়া।

'আমাদের হতাশ হওয়ার সময় এখনও আসেনি। আপাততভাবে মনে হচ্ছে আমরা কোনো ফল পাইনি। কিন্তু কল্যাণীর গালে হাত দিন ড. রায়। দেখুন একটু উষ্ণতা বুঝতে পারবেন।'

ড. গাঙ্গুলী দেখলেন। সত্যিই যেন কল্যাণীর গাল দুটো হালকা গরম লাগছে। তা হয়তো হেডফোনের কম্পনেও হতে পারে কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। কারণ ড. সেন অনেক পুরস্কার পাওয়া অন্য মাপের চিকিৎসক। তাঁর চিকিৎসায় সন্দেহ প্রকাশের বাতুলতা তাঁর সাজে না।

এইভাবে কেটে গেল আড়াই মাস। হাসপাতাল চত্বরেই দিন কাটে বিশ্বনাথের। ড. সেন এক সমাজসেবী সংস্থার ঠিকানা দিয়েছিলেন। তারাই বিশ্বনাথ ও তার স্ত্রীর খাওয়া-পরার দায়িত্ব নিয়েছে। গ্রামের লোকেরা মাঝে মাঝে খোঁজ খবর নিতে আসে। ভাড়ায় খাটা অটো দুটোর থেকে কিছু টাকাপয়সা দিয়ে যায়। এমনই অভাগা বিশ্বনাথ যে, ওই অর্থে মেয়েটাকে কিছু কিনে খাওয়াতেও পারে না। খাওয়ার মতো অবস্থাই যে নেই মেয়েটার। জীবন-মৃত্যুর মাঝ দরিয়ায় আটকে আছে ওর বেঁচে থাকার সত্যিটা। মেয়ের মা তো ফিরিঙ্গি কালীবাড়িতে হত্যে দিয়ে পড়ে আছে মেয়ের জীবন ফেরত পেতে। আশার আলো নিভতে থাকে কল্যাণীর মেডিকেল বোর্ডের ডাক্তারদের মনেও।

হঠাৎ সেদিন ১০ মার্চ, সকাল ৬টা ৪৫ মিনিট কল্যাণীর নাড়ির স্পন্দন যেন অনুভব করলেন ড. সেন, তাকালেন মনিটরের দিকে, ডাকলেন, 'সিস্টার, ভেন্টিলেশন এখন অফ করার ব্যবস্থা করুন। তারপর কল্যাণীর প্রেশার মাপুন। পর পর নির্দেশ মেনে সিস্টার প্রেশার মেপে বলল, 'স্যার, ৯০/৬০।' 'আবার ১৫ মিনিট বাদে গান শোনা শেষ হলে মাপবেন।'

সকাল ৭টায় প্রেশার মাপা হল কল্যাণীর — ১০০/৭০। সবাই এবার আশান্বিত হলেন। যুদ্ধটা বুঝি জয় করা যাবে। কল্যাণীর মাথার একটা সিটি স্ক্যান লিখে ড. সেন চলে গেলেন। ডাক পড়ল বিশ্বনাথের। 'চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে রোগী। মনে হয় আপনার মেয়ে ফিরতে পারবে আপনার কাছে। আমরা আশাবাদী,' বললেন ড. রায়। অভাবনীয় আনন্দে কেঁদে ফেলল বিশ্বনাথ, ডাক্তারবাবুকে একটা প্রণাম করতে গেল। বাধা দিলেন ড. রায়। 'আমাকে নয়, আপনার ভগবান ড. সেন, আমি নই। মেয়েকে নিয়ে যখন বাড়ি ফিরতে পারবেন, সেদিন ওনাকে প্রণাম করে যাবেন।'

লিফটে করে বিশ্বনাথ নিজে নেমে বউয়ের কাছে যায়, 'হ্যাঁ গো, আশা আছে। আমরা বোধহয় মেয়েকে নিয়ে বাড়ি যেতে পারব।' চোখে জল কল্যাণীর মায়ের ও। এ যে বাঁধ ভাঙা আনন্দের অশ্রু।

(৪)

পাক্কা তিনমাস বাদে কল্যাণী অনেকটাই স্বাভাবিক হল। তবুও আরও সাতদিন ওকে রাখা হল আইসিসিইউতে। তবে এখনও গান না-শুনলে কল্যাণীর ঘুম ভাঙে না। এখন ড. সেন কল্যাণীকে রাগ আহির ভৈরব শোনান। ঘুম থেকে ধীরে ধীরে হাসি মুখে জাগে কল্যাণী। সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ে রাত জাগা ডাক্তার ও সিস্টারদের মুখেও।

একদিন সকাল ১০টায় রাউন্ডে এসেছেন ড. সেন, ড. রায় এর রোগীকে দেখতে, তখন কল্যাণী বলে ওঠে, 'কবে বাড়ি যাব। ডাক্তারবাবু?' 'দাঁড়া, দাঁড়া, যাবি। আগে জেনারেল বেডে তোকে দেওয়া হোক, খেয়ে একটু শক্তি বাড়া। তারপর তো বাড়ি যাবি। আমাদের তো রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলি।' সস্নেহে কল্যাণীর মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন ড. রায়।

'কী রে, কলেজ পাস করে কী করবি?'

'ভালো নম্বর পেলে এম.এ করব তারপর স্কুলের চাকরির পরীক্ষা দেব। স্কুলে পড়ানো আমার স্বপ্ন। ডাক্তারবাবু।'

আরও দশদিন বাদে কল্যাণী ছাড়া পেল। বিভিন্ন বিভাগের ডাক্তাররা, নার্স, আয়ারা এসেছেন কল্যাণীকে বিদায় জানাতে। গ্রামের অনেকে এসেছে মৃত্যুর দুয়ার থেকে কল্যাণীকে সাদরে ঘরে নিয়ে যেতে আর ভগবান স্বরূপ ড. রত্নাশীষ সেনকে দেখতে। বিদায় বেলায় তিনি ছিলেন না। কিন্তু কল্যাণী তাঁকে প্রণাম না-করে বাড়ি ফিরে যাবে না পণ করেছে। মা-বাবার সঙ্গে তাই সে চলল ড. সেনের ঘরে।

'আসব, ডাক্তারবাবু?'

'ওহ্! এসো, এসো। কি! বাড়ি চললে?'

'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু।'

কল্যাণী, বিশ্বনাথ, কল্যাণীর মা তাদের ঈশ্বরকে প্রণাম করে।

'ভালো থেকো, সাবধানে থেকো। আর তিনমাস বাদে ড. রায়কে দেখিয়ে যাবে। আর-একটা কথা — তোমার জন্মদিন কবে, মা?'

'১৬ জুলাই।'

'এখন থেকে তোমার নতুন জন্মদিন পালন হবে। ১০ মার্চ, তোমার নব জন্মদিন' বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ড. সেনের দিকে বিশ্বনাথ ও তার স্ত্রী। ড. সেনের কথা তারা বুঝতে পারে না।

'হ্যাঁ করে কী দেখছেন? আপনার মেয়ের ভাগ্যবিধাতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নবজন্ম দিয়েছি আমরা। তাই ওর নতুন জন্মদিন হবে ১০ মার্চ,' বলে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করে বিদায় দিলেন।

গ্রামের লোকেদের সঙ্গে হইহই করে যেতে যেতে কল্যাণী ভাবে ভগবান কী এমনই হয়! ট্রেনে যেতে যেতে মাকে জড়িয়ে ধরে কল্যাণী বলে, 'মা, ডাক্তাররাই জীবন্ত ভগবান।' ভাষাহীন কৃতজ্ঞতা অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে মায়ের চোখ দিয়ে।

(বেহালা, কলকাতা)

লোভী

সমরকৃষ্ণ মণ্ডল

অফিসের কাজের চাপ দিনদিন বেড়েই চলেছে। একের-পর-এক কর্মী অবসর নিচ্ছে অথচ নতুন কোনো লোক আসছে না। আসবেই বা কী করে, চাকরির পরীক্ষা তো দেখছি প্রায় উঠেই গেছে। কনট্রাকচুয়াল কিছু কর্মী বিভিন্ন অফিসে এলেও এই অফিসে তেমন কেউ আসেনি। সারাদিন ফাইলের পাহাড়ে মুখ গুজে দিনাগত পাপক্ষয় রোজনামচা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সীমা বারবার ঘড়িতে চোখ রাখে, ছুটির ঘণ্টা কখন বাজবে। আজ আর প্যাভলভ হাসপাতালে যাবে না আগে থেকে ঠিক ছিল। সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দিরে মায়ের কাছে পুজো দিয়ে বাড়ি ফিরবে। এবারের চৈত্রের দাবদাহ যেন একটু বেশি। প্রবল গরমে লু-বাতাসে দমবন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু আজ অফিস ছুটির সময় শহরের আকাশে হঠাৎ কালো মেঘের আনাগোনা। এক্ষুনি বোধ হয় ঝড় উঠবে। মনে মনে ভাবছিল সীমা। দেখতে দেখতে পশ্চিম আকাশ গাঢ় কালো মেঘে ছেয়ে গেল। মুহূর্তে কালবোশেখের প্রবল ঝড় আছড়ে পড়ল অফিস পাড়াসহ শহরের আকাশে। এলোমেলো দমকা বাতাসের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। প্রায় পৌনে দু-ঘণ্টা পর বৃষ্টির দাপট একটু কমে এল। একটা স্বস্তির নিশ্বাস চারদিকে। তবে টিপটিপ বৃষ্টি তখন ও পড়ছে। বাতাসে হঠাৎ ঠান্ডার আমেজ। অফিসে অনেকটাই দেরি হয়ে গেল। সীমা অস্থির হয়ে উঠে। ফেরার সময় মায়ের মন্দিরে পুজো দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। তা আর হবে না।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি মাথায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ বৃষ্টিতে যেখানে-সেখানে জল জমে গেছে। কোথাও-বা হাঁটু জল জমেছে। বর্ষায় এ শহরের এটা চেনা রূপ। এই জল ঝাঁপিয়ে সবাই বাড়িমুখো হয়েছে। সীমা ও ফিরল। তবে কাকভেজা হয়ে। ভিজে জামাকাপড় ছেড়ে এককাপ গরম চা বানিয়ে নিয়ে ডাইনিং-এ সোফায় গা এলিয়ে দেয় সীমা। ঠান্ডা আমেজে ক্লান্ত শরীর অবশ হয়ে আসে। বিয়ের পর থেকে এমন বিবাহ-বার্ষিকীর দিনে সুদীপ কিছু-না-কিছু সারপ্রাইজ গিফট দিত। সারাদিন বাইরে ঘোরাঘুরি, খাওয়াদাওয়া দস্তুর হয়ে উঠেছিল। আর আজ আলো-আঁধারি ডাইনিংরুমে নিঃসঙ্গ একাকী সীমা।

সকালে দার্জিলিং থেকে মেঘনা শুধু ফোন করে বলেছিল, 'হ্যাপি অ্যানিভার্সারি মম', তুমি ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, মন খারাপ কোরো না। নিজের খেয়াল রেখো। এরকম কালবোশেখের দিনেই তো সব সুখ-শান্তি বিদায় নিয়েছে সীমার জীবন থেকে ওলট-পালট হয়ে গেছে সীমার সীমারেখা।

আবিরগঞ্জ মফস্‌সল শহর হলেও বেশ গ্রাম্য ছোঁয়া আছে। এই শহরে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সীমা। বাবা পোস্ট অফিসের এক্সস্ট্রা ডিপার্টমেন্টাল স্টাফ। সামান্য বেতনের কাজ, জমিজমা কিছু থাকায় তাতে চলে যেত। আবিরগঞ্জের নাম করা সরকারি অফিসার নীলেশ চ্যাটার্জী। ওর একমাত্র মেয়ে অহনা বিয়ের পর থাকেন কলকাতার বেহালায়। অহনার ছেলে সুদীপ, মায়ের সঙ্গে ছোটোবেলা থেকে বহুবার দাদুর বাড়ি আবিরগঞ্জ এসেছে।

সীমা পড়াশোনায় বেশ মেধাবী। অসাধারণ সুন্দরী না-হলেও বেশ সুদর্শনা। গাঁয়ের উন্মুক্ত জলহাওয়ায় মাঠেঘাটে ঘুরে বেড়ায় সে। চপলা, চঞ্চলা, শুচিস্মিতা সীমা পাড়ার সকলের নয়নের মণি। বাপের বাড়ি আবিরগঞ্জ এলে অহনা সবসময় সীমাদের বাড়ি যেত ওর বাবার সহপাঠী বলে। সীমা যখন কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ত সুদীপ সে-সময় পড়াশোনা শেষ করে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের প্রবেশনারি অফিসার হয়েছে, সেবার দোলের সময় অহনা সীমাদের বাড়ি ঘুরতে এসে সীমার বাবাকে বলেছিল-কীরে সুশান্ত, সীমা তো কলেজের গন্ডি পার হতে চলল? ওর বিয়ের কিছু ভেবেছিস? না, সেভাবে ভাবিনি কিছু, তবে মেয়ে যখন বড়ো হয়েছে বিয়ে তো একদিন দিতেই হবে। তবে এখন নয়। পড়াশোনা শেষ করুক। তারপর না-হয় এ ব্যাপারে ভাবব। তবে আজকালকার ছেলে-মেয়েরা তো, আমাদের সময়কার মতো নয় ওদের নিজস্ব একটা চিন্তাধারা, পছন্দ-অপছন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছা অনেক কিছু ব্যাপার আছে। সবদিক বিচার-বিবেচনা করতে হয়। হ্যাঁ, এটা তুই যা বলেছিস একদম ঠিক। এখনকার সময়ে ছেলে-মেয়েদের মতামতই আসল ব্যাপার। বলে হেসে ফেলে অহনা। তবে কিছু না-মনে করলে তোকে একটা কথা বলতে পারি সুশান্ত, আরে না না কিছুই মনে করব না বলতে পারিস। অহনা ইতস্তত-করে বলল না তেমন কিছু না, তবে তোর মেয়ে সীমাকে আমার খুব মনে ধরেছে। তোর যদি আপত্তি না-থাকে তো, সীমাকে আমার সুদীপের ...। তবে তোকে আমি জোর করব না। সীমার বাবা হেসে বলেছিল ঈশ্বরের যদি সেই ইচ্ছা থাকে তো তাই হবে।

সীমারা যদিও আভিজাত্যে অহনা পিসিদের ধারেকাছে নেই। অহনার স্বামী উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার। বেহালায় নিজস্ব বাড়ি অর্থ সম্পদের প্রাচুর্য চোখে পড়ার মতো। আর সে জায়গায় সুশান্ত নিতান্তই ছাপোষা। সুশান্তর মনে একটা কিন্তু ভাব ছিলই। যতই সহপাঠী বন্ধু হোক। তেলে-জলে তো কখনই মেশে না। সীমার একপ্রকার অমতে অহনা

পিসির জোরাজুরিতে সীমাকে বেশ ঘটা করে বিয়ে করেছিল সুদীপ। সারা আবিরগঞ্জের মানুষ বলেছিল একটা বিয়ে হল বটে। মফস্সল শহরের হলেও পাড়াগাঁয়ের মেয়ে সীমা। শহুরে কালচারে একটু অনভ্যস্ত ছিল। এখানে মানুষে মানুষে মেশামেশি কম। কেউ কারও বিষয়ে তেমন খোঁজ নেন না। বাড়ির বাইরে যাওয়া বলতে শপিংয়ে যাওয়া, সিনেমা দেখা কিংবা সময় করে দূরে-কাছে ঘুরতে যাওয়া। সবাই নিজের জগতে একা একা, জনারণ্যে ও নিঃসঙ্গ। কিন্তু গাঁ-গঞ্জে তেমনটি নয়। সবাই সবার চেনা। আপদ, বিপদ, মেলা, মোচ্ছবে সকলে সকলের আত্মীয়। অনেকটাই প্রাচীন গ্রিক পলিসের মতো। সেখানে জীবনের মানে অনেক ব্যাপক। আনন্দময়। আর শহরে খাঁচায় বন্দি পাখি। প্রাচুর্যের মধ্যেও অনাবিল আনন্দ নেই। তবে শাশুড়ি মা সব কিছু শিখিয়ে-পড়িয়ে নেয় সীমাকে। সীমার নতুন জীবন বাঁধ-ভাঙা খুশিতে ভরে ওঠে। কয়েক বছরের মধ্যে সুদীপ ব্যাংক ম্যানেজার হয়ে যায়। ঘন ঘন পোস্টিং বদলায় এ শহর থেকে সে-শহরে। নতুন নতুন পরিবেশে সীমার খুশির শেষ ছিল না। এত বড়ো ব্যাংকের ম্যানেজার তার স্বামী। সীমা মনে মনে বেশ গর্ববোধ করত। সুদীপের দুর্নিবার ভালোবাসায় মুগ্ধ হয় সীমা।

সুদীপ সেসময় ওর ব্যংকের জামশেদপুর ব্রাঞ্চের ম্যানেজার। জামশেদপুর শহরের কাছে সুদীপের ফ্ল্যাট। সীমা নতুন জায়গাতে একটু অসুবিধা বোধ করলেও বেশ খুশিতেই ছিল। ছুটির দিন গুলিতে ওরা মাঝে মাঝে ডিমনা লেক, টাটা স্টিল জুলজিক্যাল পার্ক, জুবিলি পার্কে ঘুরতে যেত। সুদীপ বন-জঙ্গল খুব ভালোবাসে আর সীমার নেশা শপিং করা। তাই কখনও বা ওরা দলমা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি বা পি অ্যান্ড এম হাইটেক সিটি সেন্টার মল-এ যেত। এক অনির্বচনীয় আনন্দে বিভোর হয়ে কাটছিল সীমার দাম্পত্য জীবনের দিনগুলি।

কিছুদিন ধরে সুদীপের ব্যবহার ও চালচলনের বেশ পরিবর্তন লক্ষ করল সীমা। মাঝে মাঝে প্রায়ই বাড়িতে ব্যাগ ভরতি নগদ টাকা এনে রাখে। অনেক সময় সীমাকে নিয়ে বেশ দামি দামি সোনার গয়না ও কিনে দেয়। প্রথম প্রথম সীমা জিজ্ঞাসা না-করলেও পরে কেমন একটা ভয় ও সন্দেহ হতে শুরু করল। তবে কী সুদীপ অসৎ পথে ...! সীমার সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল যেদিন জানতে পারল সুদীপ একই সঙ্গে কলকাতার সল্টলেকে একটি ফ্ল্যাট আর ভুবনেশ্বরে একটি বাড়ি কিনছে সীমার নামে। সীমা সেদিন রাতেই জানতে চাইল — তুমি এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় পাও? চাকরি ছাড়া কি তুমি ব্যাবসা করছ?

কেন? তোমার এতসব জেনে লাভ কী?

না লাভ কিছু নেই। কিন্তু আমি তোমার স্ত্রী। আমার জানার অধিকার আছে তুমি এত বিপুল পরিমাণ অর্থ কীভাবে উপার্জন করছ।

বেশি অর্থ রোজগার করছি। তাতে তোমার অসুবিধা কোথায়? আমার মনে হচ্ছে তুমি সৎ পথে সব কিছু করছ না।

তাহলে তুমি কী ভাবছ আমি অসৎ পথে টাকা রোজগার করছি? বলল সুদীপ।

শুধু ভাবছি না। আমি সত্যি সেটাই মনে করছি। কারণ অসৎ পথ না-হলে মানুষ এরকম লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারে না।

সুদীপ একটু বাঁকা হাসি হেসে বলল — অসৎ পথ আবার কি? অসৎ বলে কিছু হয় না। শুধু বুদ্ধির জোরে সবকিছু করতে হয়।

ছি ছি সুদীপ। তুমি ধনী ঘরের ছেলে। শিক্ষিত, রুচিশীল, মানুষ। একটি ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তুমি কি না এ সব কথা বলছ? তোমার মূল্যবোধ এত নেমে গেছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি তুমি বেআইনিভাবে প্রচুর পরিমাণ ঘুসের লেনদেন এ জড়িয়ে পড়েছ। টাকার মোহে ঘুস নেওয়াকে বুদ্ধির জোর বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করছ। তোমার লজ্জা হওয়া উচিত!

একদম চুপ করো। বাজে বোকো না। যা বোঝো না তা নিয়ে কথা বলতে এসো না-বলে ধমক দিল সুদীপ। আসলে তুমি খুব সহজ-সরল। একটা গেঁয়ো ভূত। তুমি অল্পতেই খুশি। টাকাপয়সা মানুষের জীবনে কতটা দরকারি সে তুমি বুঝবে না।

আমাকে অতটা বোকা ভেব না। অর্থের প্রয়োজন আছে তা মানি। কিন্তু তাই বলে তোমার ঘুস নেওয়া আমি সমর্থন করি না। উত্তর দিল সীমা। তুমি একে ঘুস বলছ? দেখছ না সমাজের সর্বস্তরের মানুষ সবাই সবাইকে কিভাবে ঠকাচ্ছে। মাছ দোকান থেকে ফল সবজি দোকান, জুয়েলারি থেকে পোশাকের দোকান। ইলেকট্রনিক্স দোকান থেকে ওষুধের দোকান, ডাক্তার থেকে নার্সিংহোম। বেসরকারি স্কুল থেকে সরকারি দপ্তর, হোটেল রেস্টুরেন্ট থেকে পর্যটন কেন্দ্র, মঠ মন্দির না-হয় বাদ দিলাম কোথায় না মানুষ ঠকছে। চোখ-কান খোলা রাখো সব দেখতে পাবে।

আমার এসব জানার দরকার নেই। বলল সীমা। বা! সীমা, বা! - তর্ক করবে আর কিছু জানবে না, তা হয় না। বহু রাজনৈতিক নেতারা কাটমানি তোলে, অনেকে আবার কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে অসহায় মানুষের কাছ থেকে মোটা টাকা নেয়। সর্বত্রই দুর্নীতি চলছে। তারাও তো ঠকিয়ে রোজগার করছে সেসব অন্যায় নয়। সে জায়গায় আমি মানুষকে উপকার করি তার বদলে তারা খুশি হয়ে আমাকে কিছু উপহার দেয়। একে তুমি ঘুস বলছ। আমাকে অসৎ বলছ। তাহলে সমাজে সৎ কে?

সীমা রেগে গিয়ে বলল তুমি চুপ করো সুদীপ। আমি আর পারছি না। আমি তোমার কাছে এত উদাহরণ শুনতে চাই না — বিশ্বসংসারে কে, কোথায়, কীভাবে কাকে চিটিং করছে এর ফিরিস্তি তোমার কাছে শুনতে চাই না। আমরা আমাদের কাছে সৎ থাকতে চাই। আমি যার সঙ্গে জীবন কাটাব সে সৎ ও ভালো মানুষ হবে এটা আমার স্বপ্ন। ন্যায়ের পথে যেটা পাওয়া যায় তা নিয়ে আমি খুশি থাকতে চাই। আমি তোমার পায়ে পড়ি তুমি এ পথ ত্যাগ করো।

চুপ করো আর একটাও কথা বলবে না। যদি মনে কর আমি খারাপ লোক আমার সঙ্গ ত্যাগ করতে পারো। স্ত্রী হিসেবে তোমার উচিত আমার পাশে থাকা। ছি ছি সুদীপ! ছি! সামান্য কিছু অবৈধ অর্থের জন্য নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাইছ। তুমি একেবারে পশুর পর্যায়ে চলে গেছ। তুমি এতটাই অর্থলোভী হয়ে গেছ। কী বললে তুমি? আমি পশু। হ্যাঁ! হ্যাঁ! তুমি তাই।

সুদীপ আর নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। সীমার গায়ে হাত তুলল।

তুমি আমার গায়ে হাত দিলে! তবুও তোমার পথ ছাড়বে না। কাঁদতে কাঁদতে বলল সীমা। ঠিক আছে আমি চলে যাব। তোমাকে ছেড়ে বহু দূরে। যার কাছে স্ত্রীর থেকে অবৈধ টাকার মূল্য বেশি তার সঙ্গে সংসার না-করাই ভালো।

হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই যেয়ো। আমায় মুক্তি দাও। তোমার মতো আপদ বিদায় হলে বাঁচি।

সত্যিই তো আমি আজ আপদ তোমার কাছে। চলার পথের কাঁটা আমি। তাই উপড়ে ফেলতে চাইছ। যতই অপমান করো এ কাজের সমর্থন কখনও তুমি আমার কাছে পাবে না।

সীমা বেশ বুঝতে পারছিল সুদীপ ইদানিং অর্থের অহংকারে উন্মত্ত হয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে নর্দমার পাঁকে ডুবে যাচ্ছে। নিত্যদিন পার্টিতে যাচ্ছে। অভিমুন্যের মতো দুর্নীতির চক্রব্যূহে প্রবেশ করেছে যার থেকে বেরোবার পথ ওর জানা নেই।

সেদিন সীমা উপর থেকে ড্রাইভার কে বলল, আবদুল তু কাঁহা। জলদি গাড়ি নিকালো। হামকো বাহার জানা হ্যায়।

জী মেমসাব। ঠিক হ্যায়। আপ তৈয়ার হো কর আয়ে। সীমা গাড়িতে এসে বসলে - আবদুল জিজ্ঞাসা করল-বলিয়ে মেমসাব, কাঁহা জানা হ্যায়?

হাইটেক সিটি সেন্টার মল পে চল্।

গাড়ি থেকে নামার সময় সীমা হঠাৎ দেখতে পেল সুদীপ অনেক কিছু কেনাকাটি করে ক্যারি ব্যাগ হাতে নিয়ে একজন মহিলার হাত ধরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আবদুল ও দেখতে পেয়ে বলল-মেমসাব, দেখিয়ে স্যারজি যা রাহা হ্যায়। উনকে সাথ শ্রীবাস্তব মেমসাবভি যা রেহি হ্যায়।

সীমা বলল-চুপ কর আবদুল বাত মত কর্।

সীমার সর্বাঙ্গ কাঁপতে লাগল। রক্ত চাপ বেড়ে গেল। তীব্র ঘৃণার সঙ্গে বুক ফাটা কান্না গলা দিয়ে দলা পাকিয়ে বের হয়ে আসতে চাইল। কিছুটা পরে কয়েক ঢোক জল খেয়ে সীমা বলল। আবদুল-তুম উস্ লেডি কো পেহচানতি হো।

জী মেমসাব। উস্‌কো নাম রিতু শ্রীবাস্তব। তিন মাহিনে পহলে স্যার কি অফিস মে পাবলিক রিলেশনস অফিসার পোস্ট মে জয়েন কিয়া হ্যায়।

সীমা কিছুক্ষণ উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘোরাঘুরি করল সিটি সেন্টারে। কোনো কিছুতে মন বসল না। কোনো কিছু কেনা কাটি না-করে অল্প সময়ের মধ্যে বাসায় ফিরে এল।

একটু রাত করে বাড়ি ফিরল সুদীপ। বাইরে কালবোশেখের ঝড় উঠেছে। ঝড় উঠেছে সীমার মনে!

সুদীপ ফ্রেস হয়ে এসে বলল - স্যরি, আজ অনেক দেরি হয়ে গেছে। অফিসে অনেক বাড়তি কাজ এসে যাওয়ায় লেট হয়ে গেল। সীমা চুপ করেই ছিল। কিন্তু অফিসের কাজের চাপের কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। থাক! তোমার আর কাজের কথা বলতে হবে না। সারা বিকাল তো রিতুকে নিয়ে মার্কেটিং করা, ঘোরা, আর রেস্টুরেন্টে যাওয়া এই তো তোমার কাজ। কেন সাজিয়ে এতসব মিথ্যা বলছ সুদীপ? তুমি তো জানো আমি বোকা। এত আষাঢ়ে গল্প বানানো দরকার আছে কী? বলল সীমা।

সুদীপ চমকে উঠল। ও তাই বুঝি। তাহলে চারদিকে গোয়েন্দা লাগিয়েছ আমাকে ট্রাপ করার জন্য। না ট্রাপ নয় নিজের চোখে যা দেখেছি সেটাই বললাম ধরা পড়ে গিয়ে সুদীপ আর কথা বাড়াল না। যাক টেবিলে খাবার দেওয়া আছে খেয়ে নাও। তবে- 'একটা কথা তোমাকে বলে রাখি 'অভাবে স্বভাব নষ্ট হয় জানি কিন্তু অতি সম্পদে ইতর না-হয়ে মাটিতে পা রেখে চলা বুদ্ধি মানের কাজ।'

আর কথা না-বাড়িয়ে সীমা ঘরে ঢুকে গেল। পরদিন ভোরে ট্রেনে করে সোজা ফিরে এল আবিরগঞ্জ। শাশুড়িকে সব জানিয়েও কোনো লাভ হল না। কারণ সুদীপ এখন মা-বাবার কোনো কথায় পাত্তা দেয় না।

সীমা ফিরে এলে সুদীপ বেশ কয়েকবার ফোন করেছিল বটে, কিন্তু সীমা সে ফোন রিসিভ করেনি। সীমা যে সময় চলে আসে সুদীপের কাছ থেকে সে সময় দু-মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিল। নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ এই আনন্দ সংবাদটা সুদীপকে শোনাবার মতো প্রবৃত্তি আর হয়নি। মেয়ে মেঘনা জন্মানোর পর অদম্য মানসিকতা নিয়ে পড়াশোনা করে শিক্ষা দপ্তরে এলডিসি পদে সরকারি চাকরি পেয়ে যায় সীমা। তাতেই সিঙ্গল মাদার হিসেবে সীমার সংসার চলে যায়। মেয়ে জন্মানোর সংবাদ সুদীপ কে জানিয়েছিল। কিন্তু সুদীপ কোনো উত্তর দেয়নি বা দেখতেও

আসেনি। সুদীপের এই মর্মান্তিক উপেক্ষা সীমাকে নিদারুণ আঘাত দিয়েছিল। মনে মনে শুধু বলেছিল সুদীপ জীবনে প্রথম বাবা হওয়ার স্বাদ পেলে অথচ অর্থের মোহে অন্ধ হয়ে সেই স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করার সময় পেলে না। সীমা সেদিন রাতভোর দু-চোখের পাতা এক করতে পারেনি, যেদিন সুদীপ সিবিআই-এর হাতে গ্রেপ্তার হয়। সমস্ত টিভি চ্যানেলে ব্রেকিং নিউজ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ম্যানেজার সুদীপ রায় বেশ কয়েক কোটি টাকা ব্যাংক জালিয়াতি ও প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার। পরদিন সমস্ত সংবাদপত্রে সুদীপের কুকীর্তি ফলাও করে ছাপাও হল। খনি মাফিয়া, ইন্ডাসট্রির মালিক, ভুয়ো সংস্থাসহ অনেককে অবৈধভাবে বিপুল টাকা লোন পাইয়ে দিয়েছেন কোটি কোটি টাকা ঘুসের বিনিময়ে। নির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে সিবিআই অফিসার রিতু শ্রীবাস্তবকে দিয়ে হানিট্রাপ পেতে গ্রেপ্তার করা হয় সুদীপকে। ব্যাংকের পাবলিক রিলেশনস অফিসার মিসেস শ্রীবাস্তব যে আসলে সিবিআই-এর লোক সুদীপ তা বুঝতে পারেনি।

সীমার নামে বহু বেনামি সম্পত্তি থাকায় সিবিআই সীমাকে ও তলব করল। সীমা চাকরি চলে যাওয়ার ভয়ে রাজসাক্ষী হয়ে জেরার মুখে সব কিছু বলে দিল। অনেক টালবাহানার পর সীমা প্রমাণ করতে পেরেছিল যে, সে কোনোভাবে এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত নয়। সীমার চাকরি বেঁচে গেলেও দোষী সাব্যস্ত হয় সুদীপ। সুদীপের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে চাকরি থেকে বরখাস্তের রায় দেয় আদালত। ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের বিধি অনুযায়ী সরকারি অর্থ তছরূপ, প্রতারণা, বিশ্বাসভঙ্গ জালিয়াতির দায়ে দীর্ঘ বারো বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে যায় সুদীপের। লোভের কী নির্মম পরিণতি তা হাড়ে হাড়ে বুঝল সুদীপ।

যে সুদীপের চারপাশে অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবীরা সবসময় মৌমাছির মতো ঘুর ঘুর করত, সুদীপ সিবিআই-এর হাতে ধরা পড়ার সংবাদ চাউর হতেই সবাই কর্পূরের মতো উধাও হয়ে গেল। কারাগারের বদ্ধ সেলে অল্পদিনের মধ্যেই দুর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগল সুদীপের গোলাপের মতো জীবন। পাপ-পুণ্যের ভালো মন্দের হিসেবনিকেশের টানাপোড়েনে জেরবার হয়ে উঠল সুদীপের জীবন।

সুদীপের এই পরিণতিতে সীমার শ্বশুর-শাশুড়ি একেবারে ভেঙে পড়ে। সীমা তাদের পাশে থাকে। শত হোক সুদীপ তার স্বামী। জেলে প্রথম যেদিন সীমা ছোটো মেঘনাকে নিয়ে গেল দেখা করতে, সেদিন সুদীপ আর নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি। কৃতকর্মের জন্য লজ্জাবোধ যেমন হল তেমনি বাবা হিসেবে সন্তানের প্রতি কোনো কর্তব্য পালন না-করার যন্ত্রণায় বিদ্ধ হল অন্তর। বাঁধ-ভাঙা কান্নায় লোহার গরাদের মধ্যে থেকে সীমার হাত ধরে সুদীপ বলল আমি তোমাকে অনেক অপমান করেছি, অবহেলা করেছি, আঘাত দিয়েছি। তোমার কথার কোনো মর্যাদা দিইনি। আমি সত্যিই অপরাধী আমাকে ক্ষমা করো। মেয়ে মেঘনাকে কাছে টেনে নিয়ে পাগলের মতো চুমু খেল। বলল মা ভালো করে পড়াশোনা শিখো মায়ের কথা শুনে চলো। সীমা বলল-পাগলামো কোরো না শান্ত হও, ধৈর্য ধরো। সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি যে তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ এতে আমি খুশি। নিজের অজান্তে সীমার চোখেও জল এসে গেল।

আমার কথা নাই-বা মেনেছ, কিন্তু দাগি অপরাধীদের মতো ন্যায়-অন্যায় বোধ হারিয়ে যে অপরাধ তুমি করেছ তার শাস্তি তো পেতেই হবে। 'লোভে পাপ, আর পাপে মৃত্যু', এই চিরসত্যকে এড়ানো যায় না সুদীপ। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। দেখতে দেখতে বারো বছর কেটে যাবে। মেঘনাকে আমি দার্জিলিং-এ একটা কনভেন্ট স্কুলে ভরতি করেছি।

পরদিন জেল থেকে সংবাদ এল সুদীপবাবু তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় সারারাত কান্নাকাটির পর মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে ভোররাতে সুইসাইড অ্যাটেম্পট করেছেন। সারাগায়ে ক্ষত চিহ্ন এবং লোহার গরাদে মাথা ঠুকে মারাত্মকভাবে জখম হয়েছেন। রক্ষীরা উদ্ধার করে জেল হাসপাতালে ভরতি করেছে। সংবাদ পাওয়ার পর সীমা দেরি না-করে বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়িকে নিয়ে জেলে গিয়ে পারমিশন নিয়ে সুদীপকে নার্সিংহোমে ভরতি করল। বেশ কিছুদিন চিকিৎসার পর সুদীপ শারীরিকভাবে কিছুটা সুস্থ হল বটে। কিন্তু এরপর থেকে বদ্ধ মেন্টাল পেশেন্ট হয়ে গেল। উন্মাদ অবস্থায় জেল কর্তৃপক্ষ ওকে এরপর প্যাভলভ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করল। সেখানে কেউ তাকে বিশেষ একটা দেখতে যায় না। আত্মীয়স্বজনরা খোঁজ ও নেয় না। কিন্তু সীমা সাতপাকে বাঁধা, চন্দ্র সূর্যকে সাক্ষী করে পাওয়া স্বামীকে ভুলে থাকতে পারেনি। শত অবহেলাতেও সে স্বামীর পাশে। ভারতীয় নারীর চিরকালীন ঐতিহ্য মেনে সেও মনে করে পতি পরমেশ্বর, সেই তার ইহকাল পরকাল। তা সে সুস্থই হোক আর অসুস্থই হোক। তাই স্বাভাবিক সুদীপকে ফিরে পাওয়ার আশায় বুক বেঁধে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলেও সীমা নিয়মিত প্যাভলভে যায়। এটা তার কর্তব্য মনে করে। আর এতেই তার সার্থকতা, এতেই তার আনন্দ। আপদে-বিপদে স্বামী বা স্ত্রী একে অপরকে খেয়াল রাখবে, সেবা-যত্ন, দেখভাল করবে এই শিক্ষা তো সে পেয়ে এসেছে। তা সে যতই লোভী কিংবা শাস্তি প্রাপ্ত অপরাধী হোক-না-কেন।

(বেহালা, কলকাতা-৩৪)

ভালোবাসার শহরে

অপূর্ব মিত্র

দিনটা ঠিক মনে নেই। তবে ২০২১ সালের বৈশাখ মাসের শেষের দিক কিংবা জৈষ্ঠ্যের মাঝামাঝি হবে। সময় সকাল সাড়ে সাতটার কাছাকাছি হবে। হাওড়া থেকে বাসে করে খিদিরপুর যাচ্ছি। বাসের ভিতরে ভ্যাপসা গরম, বসার আসন পেলাম না। তাই দাঁড়িয়েই চলেছি। অত সকালেও পেটের দায়ে কিছু আয়ের আশায় জীর্ণ, মলিন জামা আর হাঁটু পর্যন্ত গোটানো প্যান্ট পরে, পায়ে ক্ষয়ে যাওয়া হাওয়াই চটি, হাতে কাঁচের বয়াম নিয়ে চশমা পরা এক ক্ষীণকায় বৃদ্ধ হকার। মেয়ো রোড থেকে বাসে উঠেই হাঁক দিল, চা-ই-ই নে-বু লজেন্ট, নেবু-। চোখের সামনে ভারতমাতার হত দরিদ্র সন্তানকে দেখলাম। আসলে বাইরে থেকে যতই চাকচিক্য হোক-না কেন, ভিতরে মনে হয় দেশের একটা বিরাটসংখ্যক মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে।

এসব সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে বেশ জোরালো একটা শব্দ কানে বেজে উঠল। বাসটা সবেমাত্র মেয়ো রোড ছেড়ে কয়েক গজ এগিয়ে ডানদিকে একটু বাঁক নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে গেল। কিছুতে আর সরছে না। ব্যাস লাও ঠেলা মুহূর্তের মধ্যে সামনের দিক অসংখ্য গাড়ির যানজট তৈরি হল। চারদিকে মানুষের থিকথিকে ভিড়। কিছুদূরে ময়দানের দিকে এক মেষপালক হাতে লাঠি নিয়ে এক পাল ভেড়া সঙ্গে আপন মনে চলেছে। কিছু যুবক কাদা মাঠে ফুটবল খেলছে। কিছুটা পরে বাসযাত্রীরা উশখুশ করতে লাগল। ব্যাপার কী হল জানার জন্য। আমিও অধৈর্য হয়ে পড়লাম। সকালে এই বিপত্তিতে বিরক্ত লাগল। উঁকি দিয়ে বাসের বাইরে তাকালাম। সামনে শুধু গাড়ি আর গাড়ি। কিছুই বুঝলাম না। তবে কিছু তো একটা ঘটেছে একটা মালুম হল। সামনে এগোনোর কোনো লক্ষণ না-দেখে একসময় বাস থেকে নেমে হাঁটা শুরু করলাম। রাস্তার পাশের ধারে গাছের ছায়া ধরে হেঁটে যেতে যেতে সামনে রাস্তার পাশে মানুষের একটা জটলা নজরে এল। কাদা রাস্তায় ধীর পায়ে হেঁটে আমি ওই জটলায় মিশে গেলাম। দেখলাম সকলে বড়ো বড়ো চোখ করে ট্রাম লাইনের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন মনে হল একটা বিরাট অ্যাকসিডেন্ট ঘটেছে। বুকের ভেতরটা ছ্যাঁৎ করে উঠল। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। ভীড়ের মধ্যে একজন আন্দাজে বলে উঠল না, 'মনে হয় বাঁচবে না'। ডানদিকে তাকাতেই লক্ষ করলাম রোগীকে নিয়ে একটা অ্যাম্বাসেডার গাড়ি দূরন্ত গতিতে ট্রাম লাইন ধরে এগিয়ে আসছে এদিকে। হর্নের আওয়াজ শুনেও হতভম্ব গাম্বাটটা লাইন থেকে সরছে না। এবার নিশ্চয়ই ওকে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে যাবে। সবাই হা হুতাশ করলে ও ওর তাপ উত্তাপ নেই। যেন কিছু হবে না এমন একটা ভাব। মুহূর্তের মধ্যে একটা বিকট ক্যাঁ-এ-চ শব্দ করে কালো ধোঁয়া ছেড়ে ট্রাম লাইনে ঘসড়াতে ঘসড়াতে গাড়িটা থামল। কাদা ছিটকে দাঁড়িয়ে থাকা অনেকের গায়ে লাগল। সকলে ভাবল 'যাঃ তবে সব শেষ।' এক অদ্ভুত নীরবতায় ঢেকে গেল চারদিক।

(২)

ঘটনাচক্রে এ রাজ্যে সদ্য নির্বাচন হয়েছে। জঙ্গলমহলের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে হয়তো কোনো রাজনৈতিক দলের মিছিলের সঙ্গে বাসে চেপে নির্বোধ গাম্বাট ওই আদিবাসী যুগলের এই কলকাতা শহরে চলে আসা। তাদের স্বপ্নে দেখা এই শহরটাকে অন্তত একবার নিজেদের চোখে দেখবে বলে। গাঁটের কড়ি খরচা করে এ শহরে ঘুরতে আসার সামর্থ্য ও সুযোগ দুটোর কোনোটাই তাদের নেই। তাই বিনি পয়সার বিনিময়ে এই একটা হুজুগে তাদের দুজনে চলে আসা। এতবড়ো শহরে চোখ ধাঁধানো বড়ো অট্টালিকা, চওড়া রাস্তাঘাট, গাড়ি ঘোড়ার সীমা-সংখ্যা নেই, ট্রাম, শপিং মল, মনুমেন্ট, ইডেন গার্ডেন, মেট্রোরেল, অবাক করা ফ্লাইওভার, আর কত কী ওরা নয়ন ভরে দেখে আর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়! গঙ্গার ধার চিড়িয়াখানা-সহ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল-এর মতো স্থানগুলো ওদের মন ছুঁয়ে যায়। জঙ্গলের গাছগাছালি, নিরন্তর ঝিঁঝি পোকার কান ঝালাপালা ডাক এখানে নেই। নেই বন্যপশুদের হানাদারি। ওদের কাছে এ-এক অন্য জগৎ-এর সঙ্গে ওদের জগতের মিল নেই। এই আলোর জগৎ দেখে আর ফিরে যাওয়ার বাসনা হয়নি। আবার গিন্নির ইচ্ছা আর বেশ কিছু দিন কাটিয়ে তারপর সুযোগ বুঝে ঈশ্বর কৃপা করলে তবেই আবার গ্রামে ফিরে যাবে। কিন্তু বাদ সাধল লকডাউন। ফলে শহরের বাইরে থেকে লোক এনে মিটিং, মিছিল, বিজয় উৎসব সব বন্ধ। কিছু ইমারজেন্সি ট্রেন বাস চললেও সবাইকে উঠতে নেওয়া হচ্ছে না। তাই নিজভূমে ফেরার পথ আপাতত বন্ধ ...। এখন তারা পরিযায়ী। অগত্যা এই এতবড়ো শহরের কোনো একটা পরিত্যক্ত জায়গায় ওরা অস্থায়ী বাসাবাড়ি বেঁধেছে। সেই সুবাদের শহরের আনাচেকানাচে ঘুরে দেখা আর কিছু ঠিকা কাজ ও খাবার জোগাড় করা। পরিস্থিতি কিছুটা এখন স্বাভাবিক। সবকিছু ঠিক হচ্ছে, গাড়ি চলছে। কিন্তু দেশে ফিরতে মন চাইছে না। শহরের পার্কে যুবক-যুবতিদের তারা দেখে আর অবাক নয়নে তাকিয়ে থাকে। সোহাগ বাড়ে তাদের নিজেদের মধ্যেও। শহরের সেয়ানা পরিবেশের সঙ্গে

মানিয়ে নিতে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। মাঝে মাঝে এই সরল মতি যুগলের নিজেদেরকে বেমানান মনে হয়।

ভিড়ের মধ্যে উপস্থিতি সবার নজর ওই গাড়ির চাকার দিকে। গাড়ি চাপা পড়েছে ভেবে ভয়ে অনেকের চোখে জল চলে এল। সকলে গভীরভাবে নিরীক্ষা করছিল কোনোরকম রক্তের দাগ দেখা যায় কিনা? কর্মরত জনকয়েক মাটি কাটার শ্রমিক অসীম সাহস বুকে নিয়ে ছুটে এল উদ্ধার করতে। তারা গাড়ির চাকার দিকে এক পা এক পা করে এগিয়ে গেল। বসে তারা ভালো করে উঁকি দিয়ে দেখল। — নীরবতা ভেঙে সবাই এক সঙ্গে আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল - না না মরেনি বেঁচে আছে। গায়ে কোনো স্পর্শও লাগেনি। অবশেষে উৎকণ্ঠা কাটল।

একটা যুদ্ধ জয়ের আনন্দ সবার মনে। গুরুতর কোনো বিপদ ঘটেনি নিশ্চিন্ত হওয়ার পর পকেট থেকে রুমাল বের করে কপালে ঘাম মুছে আমিও অতি সাবধানে রাস্তার ভিড় কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম। ট্রাম লাইনের উপর ওকে জীবন্ত অবস্থায় দেখে এক স্বর্গীয় আনন্দে মন ভরে গেল। ভগবানকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ দিলাম। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগলাম — সত্যিই সাহস আছে ওই আদিবাসী যুবকের। দ্রুত গাড়ি এগিয়ে আসছে দেখে ও ওর হেলদোল নেই। ও স্থির, শান্ত। বনে হয়ত এভাবে ধীরস্থির থেকে ওরা পশু শিকার করে। কিংবা ওর মাথায় বুদ্ধি আসে এই পরিস্থিতিতে ছুটোছুটি করলে বিপদ ঘটার আশঙ্কা বেশি। তাই ও ওর অবস্থানে চুপচাপ ছিল। যা হওয়ার হবে এই ভেবে হয়ত। সত্যিই কপালের জোর না-থাকলে এরকম নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফেরা যায় না।

(৩)

দূর থেকে গাড়ি ড্রাইভারের বিষয়টি নজরে পড়েছিল। গাড়ির ভিতরে মানুষ আর রাস্তায় সামনাসামনি পথচারী। এই অবস্থায় মাথা ঠান্ডা রেখে অমূল্য একটা জীবন বাঁচানোর জন্য ড্রাইভার যে এমন এক সাংঘাতিক প্রচেষ্টা করল তাতে সবাই তারিফ করল। অনেকেই বলে উঠল, 'সত্যিই দাদা যেভাবে আপনি নিজেদের কথা না-ভেবে একটা অমূল্য প্রাণ রক্ষা করলেন মনে হল একটা যুদ্ধ জয় করলেন।'

ঈশ্বর আপমার মঙ্গল করবেন। এক বৃদ্ধা বললেন — 'আমি সবার জন্য মা কালীর কাছে একশো একান্ন টাকার পুজো দেব।' ও বলতে ভুলে গেছি যে, যাকে নিয়ে এই সাতসকালে এত কাণ্ড তিনি তখনও ট্রাম লাইনে বসে আছেন। কোনো ভয়ডর নেই। কিছু মানুষ রেগে গিয়ে গালাগাল দিতে শুরু করল-দিন দিন এইসব ছোটোলোক উজবুকদের সংখ্যা বাড়ছে কলকাতায়। তাই এ শহরের এই অবস্থা। কিন্তু এই আনপড় গাঁওয়ারদের নিয়ন্ত্রণ করবে কে? সবই রাজনীতির চক্কর ভাই। কয়েক জন তো আবার তেড়ে গিয়ে এই মারে তো, সেই মারে। তবে সে সময় ওই যুবকের চোখের দিকে তাকানো যাচ্ছিল না। তার বড়ো বড়ো চোখ দিয়ে ঠিকরে লাল আভার জ্যোতি ঠিকরে বের হচ্ছে। একেবারে পরিষ্কার চোখের কড়া ভাষায় যেন বলতে চাইছে তাকে অহেতুক আক্রমণ করলে সে কিন্তু ছেড়ে কথা ...। সাবধান এক পা ও এগিয়ো না। এগোলে আমার প্রিয়তমার জন্য এই অমূল্য সাধের প্রাণ বিসর্জন দিতে দ্বিতীয় বার চিন্তা করব না। তার চাউনিতে এতটাই আত্মপ্রত্যয়।

সামনের দিকে তাকিয়ে লক্ষ করলাম গাম্বাট যুবকের প্রেমিকা ও একই লাইনে বসে আছে। সামনে-পিছনে আসে পাশে ভিড়ের মধ্যে তার কোনো কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই। যেন সাতসকালে এত মানুষ কে বিপদে ফেলে মজা মারছে। এই সরলমতি উদোমদা অরণ্যের প্রেমিক যুগল। তারা সাঁওতালি ভাষায় নিজেদের মধ্যে কী কথা বলছে বোধগম্য হল না কারোর। তবে নিশ্চিতভাবে বোঝা গেল যে, তারা সাতজন্মের ভালোবাসার সঙ্গী। একে অপরের পাশে আছে। যতই হামলাবাজি হোক কেউ কাউকে ছেড়ে পালাবে না। ভিড়ের মধ্যে কারও মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠল — 'এমন বন্ধু আর কে আছে তোমার মতো মিস্টার ...।'

সত্যিই ওরা বন্ধু। এ অজানা শহরে থাকার জায়গা নেই। খাওয়ার সংস্থান নেই, পকেটে পয়সা নেই, শহরে পথ চলার জ্ঞান নেই, অথচ শুধু শহর দেখবে বলে, কাজের সন্ধান করবে বলে জেদ, সাহস, আর লড়াকু স্বভাব নিয়ে এখানে তারা থেকে গেছে। একজন সাঁওতাল দোভাষী যুবকের মাধ্যমে একথা জানা গেল। ওরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আসা অজ পাড়াগাঁয়ের অরণ্যচারী পরিযায়ী মানুষ। যতই বিপদ আসুক তারা কেউ কাউকে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার মতো বেইমানির মানসিকতার নয়।

একটু পরে দুজন ট্রাফিক পুলিশ এসে ওদের সরিয়ে দিলে ধীরে ধীরে যানজট কমে গেল। ওরাও হাত ধরাধরি করে নিমেষে মিলিয়ে গেল। তখনও অনেকে ওদের তাড়া করে দৌড়োচ্ছে, কিন্তু তারা কিছুতেই তাদের ধরতে পারছে না। যেন মনে হচ্ছে অত্যাধুনিক রকেট গতিতে এগিয়ে চলা আধুনিক সভ্যতা আদিম পিছিয়ে পড়া সভ্যতার পিছু ধাওয়া করছে কিন্তু তার নাগাল তারা পাচ্ছে না।

ভোরের ঠান্ডায় ঘুম ভেঙে গেল। বেশ শীত শীত করতে লাগল, ধড়ফড় করে ঘুম থেকে উঠে পড়লাম। বেশ বেলা হয়ে গেছে। ভোর রাতে কয়েক পশলা জোর বৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হল। তাই ঘরও বেশ ঠান্ডা হয়ে গেছে। রিমোট দিয়ে এসি-র সুইচটা বন্ধ করে তবেই খাট থেকে নামলাম। আসলে ভোরের স্বপ্ন এভাবে ট্রাফিক জ্যামে আটকে যাবে। তা আমি তো কখনও স্বপ্নেও ভাবিনি!

(চন্দননগর, হুগলি)

ভ্রমণকাহিনি

গুজরাট ভ্রমণ

চয়নকান্তি দাস

কচ্ছের রণ শব্দটার সঙ্গে আমার পরিচয় হয় বাল্যকাল থেকেই। তখন কত হবে বয়স, বারো কি তেরো। ভূগোল বইয়ের পাতা থেকে তখন থেকেই আমার এক অদ্ভুত ধারণা হয়েছিল যে এখানেই হয়তো গল্পের সেই কচ্ছপ আর খরগোশের রান হয়েছিল। আমার এই ভ্রমণে এই জায়গাটা দেখার একটা আলাদা উৎসাহ ছিল। পরে অবশ্য আস্তে আস্তে জায়গাটার বিশেষত্ব জানতে পেরেছিলাম বটে। কিন্তু ওই কৌতূহল ... ? থাক সেকথা। আমি খুব ভ্রমণপিপাসু। কিন্তু এই গুজরাট ভ্রমণটা কিছুতেই লাগছিল না। ভাগ্য ব্যাপারটা আমি না-মানলেও গুজরাট ভ্রমণটা বেশ কয়েকবার পরিকল্পনা করলেও বারবার ভেস্তে যায়। অবশেষে হল। হল- তো-হল অফিসের বন্ধুদের পরিবারসহ প্রায় ত্রিশ জন ও আমি সস্ত্রীক। সময়টা দু-হাজার উনিশের নভেম্বর-ডিসেম্বর। ঠিক কোভিড লক ডাউনের মাস তিনেক আগে। যদি না-হত তাহলে হয়তো গুজরাট ভ্রমণ আগামীতে এই আয়োজনে অধরা থেকেই যেত। সেদিন থেকে এই ভ্রমণ আমাদের সত্যি স্মরণীয় ভ্রমণ এবং আমরা ভাগ্যবান ভ্রমণপিয়াসী।

মানসিক প্রস্তুতি শেষ। ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিয়ে সোজা শালিমার রেলস্টেশন। এব্যাপারে আমার স্ত্রী একেবারে নিখুঁত ও সুযোগ্য সঙ্গিনী। প্রায় ত্রুটিহীন সজাগ প্রস্তুতি। দু-রাত ট্রেন যাপন। পৌঁছে গেলাম আকাঙ্ক্ষিত শেষ স্টেশন ভূজ-এ। ভূজ স্টেশনটা বলার মতো। খুব নিরিবিলি। লোকজন যাত্রী খুবই কম। ছোটো হলেও আভিজাত্য আছে। রেলব্রিজে উঠতে একটা সুন্দর লিফটও আছে। ভালো লাগল। স্টেশনের অনতিদূরেই আমাদের হোটেল। সদলে হোটেলে উঠলাম।

ভূজ শহরটা বেশ সুন্দর। একটা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অধিকারিণী। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। হোটেলের সামনে একটা বিস্তীর্ণ লেক। তাতে টইটম্বুর জল টলটল করছে। সূর্যের আলোয় যেন গলানো সোনা। হোটেলের নাম হয়তো সেই জন্যই লেক ভিউ হোটেল। হোটেলের সামনে স্বামীজির মূর্তি। নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে এই মহামানবের পদধূলিতে ভূজ অবশ্যই ধন্য। সরকারি উদ্যোগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিজেকে গর্বিত অনুভব করলাম। শহরে লোকসংখ্যা খুব কম। একটি মাঝারি আকারের বাজার। প্রাকৃতিক পরিবেশে একটি দর্শনীয় স্বামীনারায়ণ মন্দির। একটি সরকারি হাসপাতাল। বেশ গোছানো। ভালো লাগার মতো। হোটেলে বাঁধ ভাঙা আনন্দ। মুড়ি-চানাচুর খাওয়া। ছবি-ছবি-ছবি। যতই হোক-না-কেন আমার মনে সেই রান।

পরের দিন সকাল। হোটেল থেকে প্রায় আশি কিমি দূরে সেই কচ্ছের রণ। সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা। যানবাহনের চাপ নেই। গাড়ি ছুটছে দু-পাশে বিস্তীর্ণ বালিয়াড়ি। যতদূর চোখ যায় জনমানবশূন্য। দিক্চক্রবাল। রাস্তার দু-ধারে চোখে পড়ছে White Desert লেখা সাইনবোর্ড। ঘণ্টা তিনেক পরে পৌঁছে গেল নির্দিষ্ট স্পটে। একটি সুউচ্চ ওয়াচ টাওয়ার। চোখ ঘোরাতেই চোখ ধাঁধিয়ে গেল। ওই বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে পড়েছে সূর্যের আলো। চোখ ঝলসে উঠছে। যেন মনে হচ্ছে একটা রুপোলি টুকরো ছিটিয়ে ছিটিয়ে আসছে আমাদের দিকে। সূর্যের আলোতে যেন ফুটেছে অকাল জ্যোৎস্না। সাদা মখমলের চাদরে সেজেছে কচ্ছের রণ। প্রকৃতির কী মহিমা! যেন রূপকথার রানি। ওমা! সে তো বালিয়াড়ি নয়। সে তো রানিও নয় ... শুধু নুন আর নুন। চোখকে বিশ্বাস করানোর জন্য এক চিমটি নিয়ে মুখে দিলাম। ইস। ঠিক নুন। একী সৌন্দর্য দেখলাম। এস ওয়াজেদ আলির মতো জন্মজন্মান্তরে ভুলব না।

কৌতূহল শেষ। ওয়াচ টাওয়ারে উঠে খুব দূরে দেখা গেল ভারত-পাকিস্তান বর্ডার। মনের মতো করে সবার ছবি তোলার পালা । শুধু আনন্দ আনন্দ আর আনন্দ ... কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা মনে মনে ... ।

ওয়াচ টাওয়ার থেকে নেমে পড়লাম। খুঁজে দেখলাম আমার সেই হারিয়ে যাওয়া কচ্ছপ আর খরগোশের ঠিকানা। তন্নতন্ন করেও ওদের দেখা পেলাম না। হা হা হা ... । পেলাম কয়েকটা সুসজ্জিত উট যারা এই বিস্তীর্ণ নুনের প্রান্তর যাত্রীদের ঘুরিয়ে দেখিয়ে মালিকের রুটিরুজির ব্যবস্থা করছে।

অনেক স্মৃতি নিয়ে হোটেলে ফিরলাম। বাই বাই কচ্ছের রণ। ভালো থেকো কচ্ছের রণ। পরের দিন নির্দিষ্ট গন্তব্যে ... ।

ভূজকে বিদায় জানিয়ে এখন দ্বারকার পথে। অনেকটাই দূর। এটাই নির্ধারিত ছিল। সকালের খাবার হয়ে গেছে।

দুপুরে খেতে হবে পথিমধ্যে। বেড়ানোর এটাই ব্যবস্থা। কুছ পরোয়া নেই। গাড়ি ছুটছে। পৌঁছোলাম পোরবন্দর। সবার খুবই নাম শোনা জায়গা। গান্ধিজির জন্মস্থান। উৎসাহ স্বাভাবিক। গাড়িটা একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল। হেঁটেই ঢুকলাম বাড়িতে। বাড়িটা একটু মন্দির মন্দির। বেশ বড়ো। চারদিক ঘর। দোতলা। মাঝখানে আঙিনা। সাবেক বাড়িতে যেমন হয়। সরকারি রক্ষণাবেক্ষণ। ঈষৎ হলদেটে রং করা। বেশিরভাগ ঘরই সংগ্রহশালা। প্রচুর ছবি, আসবাবপত্র ইত্যাদি। তবে উল্লেখ্য গান্ধিজির আঁতুড়ঘর। বেশ দেখার মতো। মাটি দিয়ে নিকানো। এটা দোতলায়। এই পূণ্য ভূমিতে জাতির জনকের জন্ম। বাড়ির শীর্ষে জাতীয় পতাকা উড়ছে।

তবে আসেপাশে জায়গাটা পরিচ্ছন্ন নয়। খুবই লোকজনের চাপ। ব্যাবসাপত্র। রাস্তাও চওড়া নয়। দেখা সম্পন্ন হল। ভালোই লাগল। আবার সেই দ্বারকার পথে। চললাম আকাঙ্ক্ষিত শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য ভূমিতে। পৌঁছে গেলাম সন্ধ্যার ঠিক আগেই। হোটেল মীরা। বড়ো রাস্তার ধারেই। যে-যার ঘর বুঝে নিয়ে টিফিন খাওয়ার পালা। এখানে দুটো রাত থাকা। হোটেল থেকেই অনতিদূরে দেখা যাচ্ছে দ্বারকা মন্দিরের তোরণদ্বার। বেশ সুন্দর রংচঙে সুউচ্চ। Welcome লেখা আছে।

মন্দিরে যাওয়া হবে। হোটেল থেকে খুব কাছে তো তাই কেউ কেউ তখনই গেলও বটে। অনেকেই গেলাম একটু দূরে আরব সাগরের বুকে বিস্তীর্ণ একটা মনোরম জায়গায়। বেশ নির্মল আড্ডায় মেতে উঠলাম। ঘণ্টা দুয়েক থেকেই এলাম দ্বারকা মন্দিরে। পুজো দেওয়া, আরতি দেখা সাঙ্গ করে ফিরে আসি হোটেলে। রাতের খাবার খেয়ে কাটালাম। পরের দিন সকালে যাব ভেট দ্বারকা।

সকালের টিফিন সেরে নেওয়া হল। দ্বারকাই আসল শ্রীকৃষ্ণের পুণ্য ভূমি। সদলবলে পৌঁছে গেলাম। ছোটো দ্বারকাধাম। খুব যত্ন আছে একথা বলা যাবে না। লোকজন ও ব্যাবসাপত্র তেমন নেই। যাই হোক এটাই আদি দ্বারকাধীষ। দেখা হল। তারপর শান্ত সাগর ওপারে বেশ কয়েকটা মন্দির। ভুটভুটি করে পার হতে হল। বেশ মনোরম যাত্রা। সাগরের জলে ভাসছে ও উড়ছে সী গাল পাখি। ওপারে দেখা হল রুক্মিণী মন্দির, গোপীতালাও, নাগেশ্বর মন্দির ইত্যাদি। আবার হোটেলে ফেরার পথে। সাঙ্গ হল আদি দ্বারকা। এই পুণ্য স্থানে আসতে পেরে সবাই খুব খুশি। বাই বাই দ্বারকা।

পরের দিন সকালে রওনা হব বিখ্যাত আকর্ষণীয় মাহাত্ম্যপুণ্য মন্দির সোমনাথ। এলাম সোমনাথ। অর্থাৎ প্রভাস তীর্থভূমি। সোমনাথ মন্দিরের তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য এই কারণেই যে, সোমনাথ কথাটির অর্থ চন্দ্র। এটি একটি শিব মন্দির। দ্বাদশ জ্যোতিরলিঙ্গের অন্যতম ও পবিত্রতম। চন্দ্র তার স্ত্রী রোহিনীর প্রতি অতিরিক্ত আসক্তির জন্য তার আর ছাব্বিশ স্ত্রীদের অবহেলা করেন। তাই দক্ষ প্রজাপতি দ্বারা অভিশপ্ত হন। অন্য ছাব্বিশ স্ত্রী ছিলেন প্রজাপতির কন্যা। তখন চন্দ্র শিবের উপাসনা করেন। শিব অভিশাপ কিছুটা নির্মূল করেন এবং তিনি তাঁর মন্দির নির্মাণের আদেশ দেন। চন্দ্র শিবের স্বর্ণমন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির গজনির সুলতান মামুদ থেকে ঔরঙ্গজেব পর্যন্ত ছ-ছবার ধ্বংস হয় আবার প্রথমে চন্দ্র তারপর রাবণ রৌপ্য তারপর কৃষ্ণ চন্দন কাঠের তারপর ভীমদেব প্রস্তরের এবং ক্রমে ১৯৪৭ সালে বল্লভভাই প্যাটেলের পরিকল্পনায় বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে মন্দিরটি নির্মিত হয়। মন্দিরটির অলৌকিক বিষয় হল বিগ্রহটি ঝুলন্ত।

আমরা সকলেই মন্দির সংলগ্ন একটি হোটেলে ছিলাম। ফলে মন্দির দর্শনে খুব সুবিধে হয়েছিল। আমাদের স্ত্রীরা সকাল-সন্ধ্যে বা যখন-তখন ইচ্ছে মতো পুজো দিতে পেরে খুবই খুশি হয়। মন্দিরের পরিবেশ ও শৃঙ্খলা খুব ভালো। দেখা হল মন্দিরের Light & Sound, অসাধারণ আলোর কাজ। গল্পের বর্ণনায় ছিল অমিতাভ বচ্চনের কণ্ঠস্বর। চোখ ভরে দেখলাম। মনটা ভরে গেল। সুন্দর প্রযোজনা।

ওই হোটেলে আমরা তিন রাত ছিলাম। পরের দিন সকালে যাত্রা হল গীর অরণ্য। গীর উল্লেখযোগ্য। ওখানের নিয়ম মতো টিকিট কেটে বাসে করে ভিতরে ঢুকতে হল। জন্তুদের মধ্যে একটি সিংহ, সিংহ শাবক ও বিভিন্ন প্রজাতির হরিণ, শিয়াল, পাখি ইত্যাদি দেখা গেল বটে কিন্তু বাঘমামা নৈব নৈব চ। বাঘ হীন অরণ্য দর্শন করে ফিরতে হল। টিকিটের দাম যথেষ্ট বেশি মনে হল। আনন্দ আমরা করেছিলাম বটে, তবে অরণ্য খুব ভালো লেগেছে এটা বলা যাবে না। পরের দিন সকালে নির্দিষ্ট স্থানে যাওয়া হবে দিউ। একটা ছোট্ট মনোরম শহর। প্রাকৃতিক দৃশ্যে নয়নাভিরাম। এর ভৌগোলিক অবস্থান সমুদ্রকে ঘিরে। খুব সাজানো। লোকসংখ্যা খুবই কম। প্রায় ৪৫০ বছর ধরে দিউ পোর্তুগিজ ভারত অধীনে ছিল। ১৯৬১ সালে সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে ভারত প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। যাই হোক দিউ খুব আকর্ষণীয় এই কারণেই দর্শনীয় জায়গাগুলো খুব সুন্দর।

সমুদ্র উপকূলে দিউ ফোর্ট দেখার মতো। সমুদ্রের ঢেউ ক্রমাগত আছাড় খাচ্ছে কেল্লার গায়ে। কেল্লার মাথায় বেশ কয়েকটা কামান সমুদ্রের দিকে সুসজ্জিতভাবে তাক করে রাখা আছে। সমুদ্র গর্ভে আছে পানিকোটা ফোর্ট। দিউতে আছে একটা দেখার মতো চার্চ। বেশ কয়েকটি দর্শনীয় বিচ। বার্ড স্যাংচুয়ারি। গঙ্গোশ্বর মন্দির যা পাণ্ডবেরা থাকাকালীন তারা নির্মাণ করেছিলেন ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য শুধুমাত্র ফোর্ট আর চার্চটি বন্ধ থাকায় দূর থেকে দেখে নিতে হয়।

ওখানে থাকার পরিকল্পনা না-থাকায় দিউকে ভালো করে দেখা গেল না। অনেক অতৃপ্তি নিয়ে আমাদের দিউ ছাড়তে হল। তবে দিউ থেকে ফেরার পথে যে বিচটায় এসে দাঁড়ালাম তা হল নাগোয়া বিচ। এককথায় অসাধারণ। বেশ জমজমাট। অনেকেই সমুদ্রের জলে পা ভিজিয়ে নিলেন। ওখানেই আমাদের দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা ছিল। খেয়ে-দেয়ে ওই বিচে বিশ্রাম নিয়ে সোজা সোমনাথের আগের শিব সদন হোটেলে রাত্রি যাপন। পরের দিন সোমনাথের সাইট সিন। সকলে প্রাতরাশ করে দুপুরের মধ্যেই দেখে এলাম বেশ কয়েকটা মন্দির। সূর্যমন্দির, ওংকারেশ্বর মন্দির, গীতা মন্দির, পাণ্ডব মন্দির, হিংলাজ গুহা, ভালকা মন্দির, বানগঙ্গা এবং ত্রিবেণী সংগম। ফিরে এলাম হোটেলে দুপুরের খাবার খেতে। এবার সন্ধ্যের মধ্যেই বেরিয়ে যেতে হবে নির্ধারিত ভ্রমণের শেষ জায়গা আমেদাবাদ।

সোমনাথের হোটেল থেকে সাত কিমি পথ ভেরাবল রেলস্টেশন। আমাদের আমেদাবাদ যাওয়ার পথ নির্ধারিত ছিল রেলপথে। দুপুরের খাওয়া সেরে একটু বিশ্রাম নিয়ে সন্ধ্যে বেলার ট্রেন ধরতে বেরিয়ে পড়লুম। এক রাতের জার্নি। আমেদাবাদ পৌঁছোলাম সকাল ৫টা ৩০ নাগাদ। স্টেশন সংলগ্ন হোটেলে উঠলাম। হোটেল সাবাইরিন।

আমেদাবাদ গুজরাটের প্রাণকেন্দ্র। বাণিজ্যকেন্দ্রও বটে। খুব জমজমাট। কলকাতার মতো। সকালের খাবার খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হল দর্শনীয় স্থান গান্ধিনগরে অবস্থিত স্বামীনারায়ণ মন্দির বা অক্ষরধাম। বিশাল জায়গা জুড়ে এই হিন্দু মন্দির। এই মন্দিরটি সুদৃশ্য চমকপ্রদ ও বেশ আকর্ষণীয়। নিশ্চয়ই মাহাত্ম্য আছে তবে তাৎপর্য হল ভারতীয় সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের নিদর্শন বহন করছে। ভালো লাগল। বেশ সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। যাই হোক পথিমধ্যে দুপুরের খাবার খেয়ে যাওয়া হল প্রতীক্ষিত মূল আকর্ষণ সবরমতী আশ্রম।

শান্ত সবরমতী নদীর তীরে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে গড়ে উঠেছে গান্ধি আশ্রম। দারুণ সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। গাছগাছালিতে সাজানো বেশ নিরিবিলি আশ্রম। এখান থেকেই গান্ধিজি ডান্ডি অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এখানে দেখার মতো আছে বৃহৎ সংগ্রহশালা, হরেক রকম চরকা, বুক শপ, খাদি শপ, উপাসনা গৃহ এবং কিছুক্ষণ বসে প্রাকৃতিক পরিবেশ উপভোগ করা ও বিশ্রাম নেওয়ার মতো জায়গা। কিছুক্ষণ বসে ও খাদির পরিধেয় কিছু কেনাকাটা করে ফিরতে হল হোটেলে। ওই দিন রাত্রি যাপন। ভ্রমণ শেষ লগ্নে। তবে আমাদের ভ্রমণ চার্ট অনুযায়ী পরের দিন ও রাত পুরো বিশ্রাম। কিন্তু দেখা গেল বাঙালির বেড়ানোর আবার বিশ্রাম কীসের? সব দিন তো হু হু করে চলে গেল। কিছুই তো কেনা হয়নি। তাই সদলবলে ছুটতে হল আমেদাবাদের এ বাজার, সে-বাজার, বড়ো বাজার, ছোটো বাজার। ঝাঁপিয়ে পড়েছে সব দোকানে দোকানে। কে, কী কিনল? কোথা থেকে কিনল? শুধু জেনে নেওয়া। তৎক্ষণাৎ দৌড়। কেউ কিনল শাড়ি, গুজরাটি দোপাট্টা, ব্লাউজ পিস, কেউ বেড শিট, চুড়িদার, বারমুডা, ব্যাগ কেউ-বা হরেক খাবারদাবার আর কত বলব। মুহূর্তে দুটো করে লাগেজ বেড়ে গেল। কুছ পরোয়া নেই। কিনতে তো হবেই নয়তো কীসের বেড়ানো? যাই হোক এভাবেই সাঙ্গ হল। তাও মনের মতো হল কি? এ প্রশ্ন থেকেই গেল। আজ রাতে একটা অনুষ্ঠান আছে। এক বন্ধুর জন্মদিন পালন করা হবে। ভালো খাওয়াদাওয়া আছে। বন্ধু খাওয়াবে আর আমরা সবাই তাকে উপহার দেব। এটাই কথা ছিল। যাই হোক গান বক্তৃতায় মধুরেন সমাপয়েৎ। এবার নিশিযাপন। পরের দিন Back to Pavilion। সবার মনটাও ঘুরে গেছে ওই দিকে। কী পেলাম? শুধুই কী বেড়ানো? না না তাই কী হয়? বেড়ানোর তাৎপর্যই হল একদিকে সংসার — বদ্ধ জীবনে একঘেয়েমিকে কাটিয়ে যেমন মানসিক খিদেকে কাটিয়ে তোলা অনাবিল আনন্দে, অন্যদিকে অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখা। সর্বোপরি নিজেকে সমৃদ্ধ করা, শিক্ষিত করা। এতদিন ধরে আমরা একসঙ্গে চললাম যেন একটাই পরিবার। কত স্নেহ, ভালোবাসা বিনিময়, বন্ধুত্ব, মনের মিলন। এমনকী আত্মীয় হয়ে যায়। এত কিছু পাওয়াই তো ভ্রমণ। তাই তো আমরা ভ্রমণ চাই। সবাই বলে উঠল ... আসছে বছর আবার হবে।

ভ্রমণ দীর্ঘজীবী হোক।

(বেহালা, কলকাতা)

বিশেষ রচনা

অস্তিত্ববাদ ও জাঁ পল সার্ত্র

অমলেন্দু হাজরা

পর্ব - ১

প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪, ২৮ জুলাই-১১ নভেম্বর ১৯১৮) পর মানুষের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রায়—নৈতিক, সামাজিক রাজনৈতিক নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়। মানুষের বিভিন্ন প্রচলিত ধারণা ভেঙে যেতে থাকে। বিপর্যস্ত মানুষের জীবনের দিকে চেয়ে যুদ্ধে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ফ্রান্স এবং জার্মানির চিন্তাবিদ দার্শনিকরা, লেখকরা অস্তিত্ববাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তাঁরা লক্ষ করলেন মানুষের অস্তিত্বের সংকট। আপাতত দৃষ্টিতে তা ধরা পড়ে না কিন্তু সহজেই এই অস্তিত্বের সংকট ধরা পড়ে গাঢ় অন্ধকার রাতে মানুষ যখন দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে তার বিছানার কাছে কেউ একজন অপরিচিত দাঁড়িয়ে আছে বা রাত্রির অন্ধকারে আলোকজ্জ্বল রাজপথে হঠাৎ লোডশেডিং হয়ে চারধার অন্ধকার হলে। আর সে-সময় সে টের পায় নিজের অহং বা আমিত্বকে। টের পায় নিজের পৃথক চেতনাকে, খুঁজে পায় নিজের পৃথক অস্তিত্বকে।

কিয়ের্কে গার্ড, ফ্রান্‌জ কাফকা, আলবেয়ার কামু, ফিওডর ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যে যে ক্ষীণ অস্তিত্ববাদ দেখা যায় জাঁ পল সার্ত্রর সাহিত্যে তা পূর্ণ বিকশিত অবস্থায় দেখা যায়। আর তাই বর্তমানে অস্তিত্ববাদ বা Existentialism এবং সার্ত্র সমার্থক হয়ে গেছে।

সপ্তদশ শতকে রেনি ডেকার্ট অস্তিত্ববাদের মূলসূত্রে বলেছেন, 'Cogito ergosum' - I think therefore I exist- আমি চিন্তা করতে পারি তাই আমার অস্তিত্ব আছে। ডেকার্ট মনকে মানুষের সমগ্রতা থেকে বিচ্ছিন্ন দেখেছেন। সার্ত্র ডেকার্টের কথা মানেননি। মানুষের অহংবোধ বা আমির অস্তিত্ববোধই মানুষকে চিন্তা করতে শেখায়। তাই তিনি বলেছেন I exist, therefore I think.

জার্মান দার্শনিক নিটসে, হেদগার, ফরাসি দার্শনিক রুশো, ভলটেয়ার সবাই মানুষকে মুক্ত দেখেছেন। রুশো তাঁর সোশ্যাল কনট্রাক্ট-এ বলেছেন 'Man is born free yet every where he is in chains'- মানুষ জন্ম নেয় মুক্তভাবে কিন্তু প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে শৃংখলাবদ্ধ। ভলটেয়ার মানুষকে তার সামাজিক কুসংস্কার ধর্মীয় বন্ধন থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলেছেন। নিটসে বলেছেন ঈশ্বর মৃত। মানুষ নিজেকে দুর্বল শক্তিহীনভাবে তাই জাগতিক সমস্যায় সে অলৌকিক শক্তিমান ঈশ্বরে আশ্রয় নেয়। প্রকৃত তার শক্তিমান হয়ে সমস্যা মেটাবার শক্তি আছে, কিন্তু মানুষ শেষ হয় মৃত্যুর শূন্যতায়। এ তত্ত্ব নিহিলিজম নামে খ্যাত। ডস্টয়েভস্কির সাহিত্য যথা *(ক্রাইম অ্যান্ড পানিশমেন্ট)* এই তত্ত্বের উপর সৃষ্ট। হেদগার মনে করেন সাধারণ সংবেদনহীন অচেতন মানুষের কাছে মৃত্যু অদৃশ্য থাকে তাই সে ভুলে থাকে অর্থ উপার্জনে, বিবাহ, সংসার, ভোগ সম্ভোগে- কিন্তু তবু দুঃখ নানা সমস্যায় সে হতাশ অবসাদগ্রস্ত হয় আর একদিন মৃত্যুকে দেখে ভয় পায় যদি ভাবে মৃত্যুর শূন্যতার মাঝে চরম শান্তি তাহলে সে ভয় পাবে না। কামু মনে করেন জন্ম এবং জীবন একটা absurd বাখ্যাহীন ঘটনা, আর তাই মুক্ত জীবনযাপন এবং মানবিকতার কাজে ডুবে থাকাই জীবনের একমাত্র সুখ-শান্তি। *The plague*- নাটকে ড. রিউক্স দেখেছেন প্লেগের আতঙ্কময় পরিবেশে মানুষ আনন্দ করে আর বন্ধু সাংবাদিক র‍্যামবার্ট প্যারিসে প্রণয়ীর কাছে যাওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করে রোগীদের সেবা করে কিয়ের্কে গার্ড তাঁর *Either a fragment of life*-এ দেখিয়েছেন জাজ ভিলহেম কর্মে উন্নতি, প্রেম বিবাহ, বন্ধুবান্ধব সঙ্গ, আনন্দ-সুখের পরিবর্তে হতাশ এবং অবসাদগ্রস্ত করে। শান্তি পেতে তাই বাইবেলীয় ধর্মের মধ্যে ডুবতে চেয়েছেন। সার্ত্র ও কামু দুজনেই ফ্রান্‌জ কাফকার ভক্ত ছিলেন। কামু বলেছেন কাফকার *The Trial* হল বর্তমান যুগের অস্তিত্বের সংকট বা রোগ আর *The Castle* হল তা থেকে মুক্তির পথ। কাফকা তার 'মেটামরফোসিস' গল্পে প্রকাশ করেছেন

বাস্তব জীবনে মানুষ যতই তার অহংবোধকে গুরুত্ব দিক, চাকরিতে উন্নতি সংসার জীবনে, সমাজ জীবনে চাকরি স্থানে, যতই সে নিজেকে আবশ্যিক ভাবুক প্রকৃতপক্ষে কোনো ছন্দপতন ঘটনায় সে টের পায় পৃথিবীর জীবন, স্রোতে সংসারে, সমাজে, চাকরি স্থানে কেউ আবশ্যিক নয় - তার অনুপস্থিতিতে জীবন ঠিক নিজস্বভাবে সর্বত্র চলে যায়। সবাই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এসব দেখে একটা শূন্যতা অবসাদ ঘিরে ধরবে কিন্তু মেনে নিতে হবে। নায়ক গ্রিগর সামসা হঠাৎ একদিন আরশোলার মতো জীবে পরিবর্তিত হয়ে গিয়ে জীবনকে দেখেছিল।

প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনকে বিচার করলে দেখতে পাবে মানুষ মুক্তভাবে নিজের মতো জীবনযাপন করতে চায়। অথচ কী সে দেখে - কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের শত্রুতা, ঈর্ষা, বিদ্বেষ অপমান করার ইচ্ছা। সংসার ক্ষেত্রে নানা ক্ষোভ, স্বজন প্রতিবেশীদের নিন্দা, অভিযোগ আর দৈনন্দিন জীবনযাপনে হাজার সমস্যা। সে পর্যুদস্ত হয় হতাশ অবসাদগ্রস্ত হয়। অথচ ঈশ্বর নেই অনেকে মিথ্যাভক্তি, ধর্মকর্ম নিয়ে ভুলে থাকে। তোমার সমস্যা তোমাকেই মেটাতে হবে। শূন্যতার উপর ভাসমান জীবনের হতাশা, অবসাদ তোমাকেই দূর করতে হবে। আর তাকে সাধারণ অচেতন মানুষ না-হয়ে সুসংস্কৃত চেতনা নিয়ে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে। অস্তিত্ববাদী মানুষ চায় সব মানুষ স্বাধীন ও মুক্ত থাকুক তাই সে মানবতাবাদী (Humanist)। অথচ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক জটিল-একজন অন্যজনের কাছে বস্তুর মতো প্রতিভাত হয়। পরস্পরের স্বাধীন কর্মধারা সংঘাত ঘটায় অন্যের সঙ্গে, ফলে তৈরি হয় পৃথিবীর সর্বত্র বিশৃংখল বা Irrational বা অশান্তিময় পরিবেশ। আর সংঘাত সৃষ্টি করে মানসিক বিকৃতি নানা Psychological, Emotional কর্ম, sadism, masochism চাইল্ড পর্ণোগ্রাফী এবং নানা নেশা। অথচ কোনো সার্বজনীন নীতি মান সৃষ্টি সম্ভব নয় এবং একটা চটচটে মধুর মতো তরলের আবর্তে মানুষের চলমান চেতনা আটকে যায়। সার্ত্র প্রথম দিকে নারী-পুরুষের প্রেমে পরস্পরকে আত্মস্যাৎ করাকে এমন তরল পদার্থের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন আর এসব হলে চেতনার অবনমন বা degradation যা সৃষ্টি করে bad faith বা মন্দ বিশ্বাস, আর সৃষ্টি করে এক চেতনা থেকে দুটো চেতনা একটা হল শুদ্ধ অহং বা আমিত্ব বোধ বা Conciousness of ego বা 'I' আর একটা হল অন্যবোধ বা Conciousness of World বা অন্যরা। শুদ্ধ চেতনা হল The in-itself আর একটা degraded চেতনা The for itself (ভারতীয় দর্শনের শুদ্ধ চেতনা বা আত্মা এবং মায়াযুক্ত আত্মা) আর ইচ্ছা বা desire মানুষের Ego-ই কে রক্ষা করে, জীবনকে প্রবাহমান করে, বর্তমানকে অতীত করে তারপর বর্তমান থেকে নিয়ে যায় ভবিষ্যতের দিকে। অশুদ্ধ চেতনা সৃষ্টি করে bad faith বা মন্দ সংস্কার তার হ্রাস বৃদ্ধি হয় সামাজিক, ধর্মীয় রাজনৈতিক পরিবেশের উপর। আর প্রকৃত নিয়ন্ত্রণদাতা হল রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। সার্ত্র প্রথম দিকে বিশ্বাস করতেন কমিউনিজম হল সেই উত্তম শাসনব্যবস্থা যা অস্তিত্ববাদ রক্ষা করে। আর তখন তিনি হন কমিউনিজমের এক বড়ো প্রবক্তা। পরবর্তীকালে কমিউনিস্ট দেশ রাশিয়ার অন্য দেশ আক্রমণ এবং জনগণের স্বাধীনতা হীনতায় মনে হয়েছে ওই শাসনব্যবস্থাও অস্তিত্ববাদীদের যোগ্য স্থান নয় তাই সার্ত্র কমিউনিজমের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন।

পর্ব-২

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ জুন জাঁ পল চার্লস আয়মার্দ সার্ত্রর জন্ম হয় প্যারিসে। পিতা জাঁ ব্যাপটিস্ট সার্ত্র ফরাসি নৌবাহিনীর দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট ছিলেন এবং ফরাসী ইন্দোচীনে কর্মরত অবস্থায় আন্ত্রিক রোগে তাঁর মৃত্যু হয়। আর তখন সার্ত্রর বয়স মাত্র পনেরো মাস। মা অ্যানি মারি সার্ত্রকে নিয়ে চলে আসেন জার্মানির Alsace-এ পিতা চার্লস ও মাতা লুসি সোয়েজারের কাছে। চার্লস ভাষা শিক্ষক ছিলেন — লেখক হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, পারেননি। তাই নাতির মধ্যে সে স্বপ্ন পূরণ করতে চেয়েছিলেন-যা একদিন সার্থক হয়েছিল। সেজন্য সার্ত্রকে উচ্চমানের শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। সার্ত্র-র অবশ্য দাদামশাই-এর উপর ক্ষোভ ছিল, জোর করে তার চিন্তাভাবনা চালানোর অভিযোগ করেছেন আত্মচরিত *The words* বই-এ — 'I hated my childhood and

everything that remains from it.' সুশ্রীহীনতা, ঝগড়া করা, মিথ্যা কথা বলা ইত্যাদির জন্য বাল্যকালে সমবয়সিদের কাছে অপ্রিয় ছিলেন। অসুখে একটা চোখ ট্যারা হয়ে যায়-হাতে পায়ে-যন্ত্রণা এবং নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পেতে ব্যবহার করতেন অ্যামফ্যাটামিন, মেসকালিন, অ্যাসপিরিন ইত্যাদি। মাঝে মধ্যে হ্যালুসিনেসনে ভুগতেন। স্বপ্নে জাগরণে মনে হত সমুদ্রের বৃহৎ কাঁকড়ারা তাকে তাড়া করেছে। বাল্যকালের একাকীত্ব আর কাঁকড়ার ভয় হয়ে যায় চিরকালের সঙ্গী। ১৯১৭ সালে মা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নেভী ইঞ্জিনিয়ার যোসেফ ন্যান্সিকে। স্থানীয় স্কুলে তার স্বভাব বদলায়নি বলে তাকে পড়তে পাঠানো হয় প্যারিসের Lycee Henry IV স্কুলের বোর্ডিং-এ। শিক্ষা জীবনের কথা বলতে গিয়ে সার্ত্র বলেছিলেন নাই-বা থাকুক সঙ্গী-ছিল আমার *Golden brain*-বই-ই ছিল একমাত্র সঙ্গী। মতের সংঘাতে হারিয়েছেন বাল্যবন্ধু Nizan-কে এবং পরবর্তীকালের বন্ধুদের কামু, পয়েন্টি এডমন্ড হুসারেলের মত ব্যক্তিত্বদের। ১৯২৪-২৮ পর্যন্ত পড়েন Ecole Normale Superieur -এ। ওখান থেকে বিএ, এমএ পাস করেন। পরে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক হওয়ার পরীক্ষায় বসেন। প্রথমবার অকৃতকার্য হওয়ার পর পরীক্ষায় প্রথম হন এবং পরিচয় হয় সহমতবাদী সিমন দ্য ব্যুয়েভারের সঙ্গে (১৯২৯)। যিনি হন তাঁর চিরকালের সঙ্গিনী যদিও প্রথাগত বিবাহ হয় নি। সার্ত্র ১৯২৮-৩৪ পর্যন্ত Le Havre কলেজে দর্শনের অধ্যাপক হন। ১৯৩৩-৩৪ স্কলারশিপ পেয়ে জার্মানির যে কলেজে যান সেখানের চ্যান্সেলার ছিলেন হিটলার।

১৯৩৯-এ সার্ত্র আবহবিদ হিসেবে ফরাসি সৈন্য বাহিনীতে যোগ দেন এবং জার্মান বন্দি হিসেবে থাকেন আর-এক খৃস্ট মাসে ফরাসি বন্দিদের নিয়ে ফ্যাসী বিরোধী নাটক করেন। ১৯৪০ জুন থেকে ১৯৪১ মার্চ পর্যন্ত বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়ে প্যারিসে চলে আসেন। ক্রমে সাহিত্য সাধনায় নিজেকে নিমজ্জিত করেন। কফিশপে বসে লিখ তেন মুখে থাকত লম্বা পাইপ বা চুরুট বা সিগারেট।

সার্ত্র ১৯৪৫-এ আমেরিকা এবং ১৯৫০-১৯৬৭ মধ্যে রাশিয়া, কিউবা, চিন ('55) মিশর, জেরুজালেম, গাজা ('67) প্রভৃতি বহুদেশ ভ্রমণ করেন আর লেখেন অ্যান্টি কলোনিজম, বর্নবিদ্বেষ নিয়ে। ১৯৭৬-তে জেরুজালেমের হিব্রু ইউনিভার্সিটি থেকে অনারারী ডক্টরেট পান।

১৯৪৫ এর পর তাঁর লেখা ক্রমশ জনপ্রিয় হয়। ১৯৪৫ সালে প্যারিসের Clubmain Tenant-এ তার বক্তৃতা শোনার টিকিটের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়-যা পরে 'Existentialism is a Humanism' নামে বের হয়। ১৯৬৪-তে নোবেল কমিটি তাকে নোবেল প্রাইজ দেন কিন্তু বুর্জোয়াদের প্রাইজ বলে গ্রহণ করেননি। তার শেষ বই হল মাদাম বেভারীর লেখক গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের আত্মজীবনীর প্রথম দু-খণ্ড '71 সালে এবং তৃতীয় খণ্ড '72 সালে। এর পরই তার শরীর ভেঙে পড়ে শৈশবে নষ্ট চোখ এবং অন্য চোখ ক্ষমতা হারায় তিনি প্রায় অন্ধ হয়ে যান। ১৯৮০ সালের ১৫ এপ্রিল শ্বাসকষ্ট রোগে মৃত্যু হয়। শবযাত্রায় ২৫ হাজারের বেশি লোক ছিল। রেখে যায় কন্যা Arlitte Elkain Satra-কে। পরে ব্যুয়েভার মারা গেলে একই স্থানে কবরস্থ করা হয়েছিল।

।। তিন।।

সার্ত্রর প্রথম উপন্যাস *নসিয়া* (Nausea) বের হয় ১৯৩৮-এ। ওই সময়ে সার্ত্র Lycee'র পোর্ট হ্যাভরের কলেজে শিক্ষকতা করতেন। থাকতেন স্টেশনের কাছেই একটা সস্তা হোটেলে। উপন্যাসে ওখানকার পরিবেশই পরিবেশিত হয়েছে। নায়ক তার নিজের প্রায় আদলে। উপন্যাসের প্রথম নামকরণ করেছিলেন *ম্যালনকলিয়া* পরে ওই নাম দেন। বই-এর মধ্যে যেসব বক্তব্য বলেছেন অস্তিত্ববাদ বিষয়ে তা পরবর্তীকালে *Being and Nothingness* (1945) নামে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নায়ক আঁতোয়ান রোকেঁতা একজন বুদ্ধিজীবী বয়স ত্রিশ, পৈত্রিক সম্পত্তির উপর জীবনধারন করেন, দেশ বিদেশ ঘুরে ক্লান্ত নিঃসঙ্গ। তিনি রহস্যময় ব্যক্তিত্বের মানুষ Marquis de Rollebon-এর উপর গবেষণারত-তার জীবনী লেখার জন্য। তার মধ্যে অচেতন চলৎশক্তি হীন চিন্তাহীন বস্তু দেখলেই বমির ভাব আসে —তা নুড়ি পাথর দেখে হোক বা চেস্টনাট গাছ দেখে হোক। তাঁর মনে হয়, Every existing things is born without reason prolongs itself out of weakness and died by chance। আর তার মনে হয়েছে রোলিবানের জীবনী লেখা বৃথা ওর ব্যক্তিত্ব তার বুদ্ধিজনিত ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়। কফি হাউসে বন্ধু পিয়েরকে না-দেখে তার কাছে কফি হাউসের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে যায়। The necessary condition for our saying is that not

being be a perpetual presence in us and outside of us that nothingness haunts being, একটা কফি শপে এসে এক নিগ্রো রমণীর জাজ সংগীতের মধ্যে তিনি আবিষ্ট হয়ে যান - তার বমির ভাব চলে যায় রোকেঁতা স্থির করল উপন্যাস, গল্প ও নাটক লিখে জীবন কাটাবে।

সার্ত্র তাঁর পরবর্তী উপন্যাস *দি এজ অব রিজন, দ্য রিপ্রীভ, আয়রন ইন দি সোল* তিনটি বইকে একত্রে রোড টু ফ্রিডম নাম দেন। এর চতুর্থ খণ্ড বার করতে চেয়েছিলেন দুটি পর্য্যায়ে-এ স্ট্রং ফেন্ডশিপ এবং দি লাস্ট চান্স হিসেবে। কিন্তু তা অসমাপ্ত রাখেন কারণ বইগুলোর মধ্যে নায়ক দেলারু ম্যাথু হলেন সার্ত্র-স্বয়ং (প্রায়) যিনি দর্শনের অধ্যাপক। বইগুলোর মধ্যে আছে ম্যাথুর অস্তিত্ববাদ নিয়ে ভাবনা, তার পরিণাম এবং কমিউনিজমের উপর আস্থা যা অস্তিত্ববাদকে বিকশিত করতে সাহায্য করবে। বক্তব্যের জন্য অজস্র চরিত্র এসেছে বিভিন্ন দেশের। কিন্তু কমিউনিজমের উপর শেষপর্যন্ত বিশ্বাস রাখতে পারেননি তাই চতুর্থ খণ্ড অসমাপ্ত।

অস্তিত্ববাদী মানুষ সম্পর্কে *দি এজ অব রিজনে* দেলার ম্যাথুর বক্তব্য: "He was free, free for everything, free to act life, an animal or like a machine. He could do what he wanted to do, nobody had the right to advise him. He was alone in a monstrous silence, free and alone without an excuse condemned to decide without any possible recourse, condemned forever to be free".

সার্ত্রর গল্পগুলির মধ্যে প্রফেসার হেনরি peyre বলেছেন শ্রেষ্ঠ হল 'ইন্টিমেসি'। 'ইন্টিমেসি'-তে যৌন ক্ষমতাহীন স্বামী হেনরিকে ছাড়তে চায় না লুলু। অথচ যৌন সুখের জন্য পিয়েরের সঙ্গে ঘর ছাড়ে আর পরে তার মনে হয়েছে যৌন সুখ, সম্ভোগ সাময়িক আনন্দ দেয় কিন্তু প্রীতি ভালোবাসা পরস্পরের উপর নির্ভরতা সমঝোতা নিঃসঙ্গ হীনতা সামাজিকতার প্রয়োজন বেশি। তাই সে কামহীন প্রেমের জন্য হেনরির কাছে আবার ফিরে আসে।

সার্ত্র তার অস্তিত্ববাদে বারংবার বলেছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত এড়ানো কঠিন আর তার *নো এক্সিট* নাটক হল এই বিষয় নিয়েই। বইটা নাটক হিসেবে প্যারিসে জনপ্রিয়তা পায় Theatre du vieux-এ (1944): 1962-তে সিনেমাও হয়। নাটকে মাত্র চারজন চরিত্র একজন পুরুষ সাংবাদিক Joseph Garcin। দুজন নারী Inez Serano, আর Estelle Rigault। আর তাদের উপর নজর রাখতে ফাই ফরমাজ শুনতে আছে একজন ভ্যালেট বা চাকর। পুরুষ আর নারী দুজন মৃত্যুর পর নরকের এক বদ্ধ ঘরে আবদ্ধ ঘরের মধ্যে জানালা নেই, টুথব্রাশ নেই, আয়না নেই- আর ওখানে দিবারাত্র নেই ঘুম নেই -কেন-না মৃত্যুর পর ওসবের প্রয়োজন নেই। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হয় পরস্পরের অতীত জানতে। পরস্পরের উপর অবিশ্বাস সন্দেহ নিয়ে সময় কাটায়। জানতে পারা যায় গারসিন জীবিত অবস্থায় স্ত্রীর সঙ্গে কুব্যবহার করত এবং যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনে executed হয়েছিলেন। inez খুড়তুতো দাদার বউ ফ্লোরেনটাইনের সঙ্গে সমকামে লিপ্ত ছিল। নরকে এসেও সে Estelle-কে সমকামী হিসেবে পেতে চেষ্টা করে। Estelle স্বামীকে ঠকায়। অবৈধ প্রেমের সন্তানকে জলে ডুবিয়ে দিয়ে হত্যা করে। তারা নরকের কোনো শাস্তি পায় না। আগুনে পোড়ানো বা অন্য কিছু দিয়ে নিজেদের সঙ্গই তাদের শাস্তি দেয়। আর শেষে গারসিন বলে নরকে শাস্তি পাওয়ার জন্য আগুনের দরকার নেই। *Hell is other people* সার্ত্রর আর এক বিখ্যাত নাটক *The Flies* বের হয় ১৯৪৩-এ। নাটকে সার্ত্রর ঈশ্বর এবং ধর্ম বিষয়ক বাস্তব জীবনে সাহসিকতা দ্বিচারিতাহীন হওয়ার ভাবনা আছে। নাটকটি প্রাচীন গ্রিক নাট্যকার সোফোক্লিস এসকাইলাস প্রভৃতিদের প্রিয় বিষয় ইলেকট্রা নিয়ে যাতে সে পিতা আগামেননের হত্যার প্রতিশোধ নিতে ষড়যন্ত্রী মাতা Clytemnestra ও তার উপপতি Aegisthus-কে হত্যা করতে দাদা Orestes কে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। হত্যার পর দেবতা জিউস ইলেকট্রাকে তার পাপের শাস্তি নিতে এবং ধর্মে আশ্রয় নিতে বলে। ইলেকট্রা রাজি হয় কিন্তু Orestes এটাকে পাপই মনে করে না ধর্মের আশ্রয় নিতে ও চায়না। অনেকের মতো সার্ত্র ব্যঞ্জনায় নাৎসি বাহিনী প্যারিস অধিকার করলে তৎকলীন নায়কদের কাপুরুষোচিত জনগণের সঙ্গে দ্বিচারিতাসুলভ আচরণ-এর মুখ্য বিষয়-উপকথা একটা উপলক্ষ্য মাত্র।

অস্তিত্ববাদের শেষ পরিণতি নিয়ে হতাশ সার্ত্র জীবনের শেষ দিকে বলেছিলেন — 'পৃথিবী আজ মনে হচ্ছে যেন কুশ্রী, খারাপ আশাহীন। তার ভিতরে যে বৃদ্ধ সে মারা যাবে। এ হল তার শান্ত নৈরাশ্য। কিন্তু আমি প্রতিরোধ করছি এবং আমি জানি আমি আশা নিয়েই মরব। কিন্তু এই আশাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।'

(বেহালা, কলকাতা)

প্রবন্ধ

বাংলা ক্যালেন্ডারের ১ তারিখ

ভারত পণ্ডিত

পৃথিবীতে অতীত, বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ নানান ঘটনাবলি কিংবা স্মৃতিকে ধরে রেখেছে, বলতে পারেন বহন করে, বহন করে চলেছে 'সন' আর 'তারিখ'। এবং এই সন-তারিখের ধারাবাহিক পরিসীমাকে অটুট বন্ধনে আবদ্ধ করেছে যে-মাধ্যম, তা হল 'ক্যালেন্ডার বা দিনপঞ্জিকা।' কাল প্রবাহের কোনো সূচনা বা সমাপ্তি না-থাকলেও বর্ষ-মাস-দিন-ক্ষণের আবর্তনকে সীমায়িত করার প্রচেষ্টা সভ্যতার প্রগতির উষালগ্ন থেকেই চলে আসছে। আর সেদিক দিয়ে বিচার করে বলা যায়, ক্যালেন্ডারই হল পৃথিবীর বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির মধ্যে অন্যতম। আসলে এটি সভ্যতার মাপকাঠি হিসেবে সাক্ষী হয়ে নির্ধারকের ভূমিকা নেয়। যখন ক্যালেন্ডার ছিল না তখন দিনে সূর্যের আলো, রাতে নিকষ অন্ধকারে আকাশে মিটিমিটি তারা আর মায়াবী চাঁদ। ভারতে বিভিন্নভাবে বর্ষ গণনার প্রচলন একাধিক পর্যায়ে ছিল। কালের প্রবহমান ধারায় একে একে বিক্রমাব্দ, শকাব্দ, গুপ্তাব্দ, বুদ্ধাব্দ, চৈতন্যাব্দ, লক্ষ্মণাব্দ, হর্ষাব্দ, পালাব্দ, বঙ্গাব্দ ইত্যাদি আজও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে। প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষ ধর্মপ্রধান ও উৎসব, পার্বণের দেশ। সে কারণে, প্রাক্‌পর্বে ভারতে বছরের হিসেবের সূত্র ছিল শরৎকাল। জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ সূর্য এবং চন্দ্র পরিক্রমার হিসেবে সৌর এবং চান্দ্র বর্ষ বা সনরূপে গণনা সঠিক বলে মেনে নেয়। এই দু-ধরনের বছরের মাসকে সৌরমাস ও চান্দ্রমাসরূপে চিহ্নিত করা হয়। নিজের অক্ষের ওপর ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী সূর্যকে ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ডে একবার প্রদক্ষিণ করে। অন্যদিকে চাঁদের সময় লাগে ৩৫৪ দিন ৮ ঘণ্টা ৪৮ মিনিটের একটু বেশি। অর্থাৎ চান্দ্রবর্ষের চেয়ে সৌরবর্ষ মোটামুটি ১১ দিন বেশি। সে যাই হোক, ভারতবর্ষে যখন যে-ধর্মের, জাতির রাজা বা সম্রাট শাসনভার গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কাজকর্মের ও উৎসবের সুবিধার্থে তাঁরা নিজেদের মতো করে এই দিনপঞ্জিকা রচনা ও সূচনা করেন। যেমন, ভারতবর্ষে গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে এদেশে প্রচলিত ছিল গুপ্ত সংবং (গুপ্তাব্দ)। এরপর রাজা হর্ষবর্ধন চালু করেছিলেন হর্ষাব্দ, বাংলার পাল রাজাদের আমলে সারা বাংলায় প্রচলিত হয়েছিল পালাব্দ, রাজা লক্ষ্মণ সেন প্রচলন করেছিলেন লক্ষ্মণ সংবৎ (লক্ষ্মণাব্দ), রাজা বিক্রমাদিত্যের আমলে চালু ছিল বিক্রমাব্দ, শক আমলে সূত্রপাত ঘটেছিল শকাব্দ, মুসলমান শাসনকালে এদেশে রাজকীয় কাজে ব্যবহৃত হত হিজরি সন, জালালি সন, সিকানন্দ সন ইত্যাদি। তবে এইসব দিনপঞ্জিকা ছিল মূলত আঞ্চলিক, কোনোটিরই সর্বভারতীয় স্বীকৃতি ছিল না।

এবার একটু ইতিহাস ঘাঁটা যাক। মোগল সম্রাট আকবর ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারি দিল্লির মসনদে আসীন হন। সেই সময় হিজরি সনের প্রচলন ছিল। মুসলমানগণ এই ক্যালেন্ডার মেনে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতেন। কিন্তু তাতে সমস্যা যেটি হল চান্দ্রবর্ষে এই হিজরি সনের নিয়মে ফসলের মরশুম নির্ধারণের মাস ঠিক করা থাকে না। ফলে খাজনা আদায়ের বেশ অসুবিধা দেখা দিল। এ সমস্যা মেটাতে সম্রাট নিজে তাঁর রাজসভায় রাজজ্যোতিষী ও পণ্ডিত আমির ফাতেহ উল্লাহ সিরাজিকে সৌরবর্ষ ভিত্তিক ফসলি সন প্রবর্তনের নির্দেশ দেন। আকবরের সিংহাসনের আরোহণের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত আমির সিরাজি ৯৬৩ হিজরি সনকে ফসলি সনরূপে মেনে নিয়ে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দের ১১ এপ্রিলকে পয়লা বৈশাখ ধরে গণনা করার রীতি চালু করেন। পরবর্তীকালে এর নামই বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন হয়। সে হিসেবে হিজরি প্রথম থেকে ৯৬৩ বর্ষ পর্যন্ত বঙ্গাব্দের প্রথম স্তর। বলা বাহুল্য, চান্দ্র দিনপঞ্জি হওয়ার কারণে ৯৬৩ হিজরি সনের পর থেকে হিজরি সন সৌর দিনপঞ্জির বাংলা সনের তুলনা ক্রমান্বয়ে এগিয়ে চলেছে। আবার শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দ উভয়ই সৌর অব্দ, উলেখ্য, খ্রিস্টাব্দ থেকে ৭৮ বিয়োগ করলে শকাব্দ এবং বঙ্গাব্দের সঙ্গে ৫১৬ যোগ করলে শকাব্দ পাওয়া যায়।

অন্য মতে, এদেশে শক ক্যালেন্ডারকে বিজ্ঞানসম্মত করেন, বিখ্যাত দার্শনিক, জ্যোতির্বিজ্ঞানী গণিতজ্ঞ বরাহমিহির। শক জাতিভুক্ত এই বরাহমিহির সূর্যের প্রখরতার কারণে বৈশাখকে প্রথমে মাস হিসেবে ধরে চলার প্রচলন করেন। এই শক ক্যালেন্ডারে প্রথম গ্রিক নাম লেখা হত। পরবর্তীতে তা পালটে ভারতীয় নামকরণ করা হয়। এর আগে খ্রিস্ট্রীয় প্রথম শতক পর্যন্ত চালু ছিল বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ক্যালেন্ডার। ঋগ্‌বেদের সময়, দিন বোঝানো হত নক্ষত্রের উলেখ করে। সেটা সাতবাহন রাজত্বকালে। ভৌগোলিক মতে, বাংলা সনের সঙ্গে শকাব্দের মাসগুলি যুক্ত করে বিভিন্ন নক্ষত্রের নামে বাংলা ১১ মাসের নাম রাখা হয়েছে — বিশাখা নক্ষত্র থেকে বৈশাখ জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা থেকে শ্রাবণ, ভাদ্রপদা থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্রিকা

থেকে কার্তিক, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, ফল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র মাসের নামকরণ হয়েছে। শুধুমাত্র অগ্রহায়ণ মাসের নাম কোনো নক্ষত্রের নামে হয়নি। কিন্তু কেন? এবার সেই ব্যাখ্যায় আসি। অগ্রহায়ণ মাসকে আগে বছরের প্রথম মাস হিসেবে গণ্য করা হত। *পুরান*-এর মতে, *গীতা*-য় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই অগ্রহায়ণ মাস হল 'মার্গ শ্রেষ্ঠ।' আসলে অগ্র মানে 'পূর্ব' এবং আয়ন মানে 'বর্ষ।' সে কারণে, এরূপ নামকরণ হয়েছিল। তাই আজও গ্রাম-বাংলার কৃষকরা অগ্রহায়ণ মাসের ফসলের মরশুমকে কেন্দ্র করে 'নবান্ন' উৎসব পালন করে আসছে।

প্রখ্যাত গবেষক ড. নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, 'সমগ্র বাংলা দেশের বঙ্গ নাম লইয়া ঐক্যবদ্ধ হওয়া হিন্দু আমলে ঘটে নাই, তাহা ঘটিল তথাকথিত পাঠান আমলে এবং পূর্ণ পরিণতি পাইল আকবর আমলে, যখন সমস্ত বাংলা দেশ সুবা বাংলা নামে পরিচিত হইল। ইংরাজ আমলে বাংলা নাম পূর্ণতার পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।'

'সুবা বাংলা' সম্রাট আকবরের আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও, বঙ্গাব্দের প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ বাংলা সন উদ্ভাবনের পেছনে স্বয়ং আকবরের অবদানকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে আমরা যে-বাংলা নববর্ষ বা বর্ষবরণ বঙ্গ সংস্কৃতি উৎসব পালন করছি তার মূল উৎস হল সম্রাট আকবরের প্রচলিত 'নওরোজ' উৎসব। এর অর্থ নতুন দিন, নতুন বছর।

তাই বাংলা পঞ্জিকার প্রথম মাস বৈশাখ। গ্রেগরীয় বর্ষপঞ্জি অনুসারে ইং-১৪ বা ১৫ এপ্রিল। তবে বাংলা ক্যালেন্ডারের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই, বাংলা সনের শুরু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভোরবেলা যেখানে হিজরি সনে নতুন বছর শুরু হয় সন্ধ্যায় নতুন চাঁদের আগমনে আর খ্রিস্টীয় সন শুরু মধ্যরাত্রে ১২টার পর। এখানে স্মরণীয়, ভারতের স্বাধীনতার পর ড. মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে গঠিত হয়েছিল — 'ক্যালেন্ডার রিফর্ম কমিটি' এবং 'বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা'-এর জন্ম।

বাংলা 'নববর্ষ' বাঙালি জীবনে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। নতুন বছরকে উৎসব দ্বারা সাদরে গ্রহণ করার দিন নববর্ষের পূর্ণ প্রভাবে বাঙালির কণ্ঠে গীত হয় বিশ্বকবির সেই অমোঘ ঘোষণা:

'মুছে যাক গ্লানি,
ঘুচে যাক জরা,
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।।'

দিন, পঞ্জিকা, সময়, সাল সারণি :

দিন পঞ্জিকা	সময়	সাল
১. কলিঙ্গাব্দ	—	১৮ ফেব্রুয়ারি ৩১০২ খ্রি. পূ.
২. সপ্তঋষি	—	৩০৭৬ খ্রি. পূ.
৩. বৌদ্ধাব্দ	বুদ্ধের জন্ম	৫৬০ খ্রি. পূ. (শ্রীলঙ্কাবাসীদের মতে)
৪. মহাবীরাব্দ	মহাবীরের জন্ম	৫৯৯ খ্রি. পূ.
৫. বিক্রমাব্দ	বিক্রমাদিত্যের আমলে	৫৮ খ্রি. পূ.
৬. শকাব্দ	কনিষ্কের রাজত্বকালে	৭৮ খ্রি.
৭. কলচুরি অব্দ	কলচুরি সময়কালে	২৪৮ খ্রি.
৮. গুপ্তাব্দ	গুপ্ত যুগে	৩১৯-৩২০ খ্রি.
৯. হর্ষাব্দ	হর্ষবর্ধনের শাসনকালে	৬০৬ খ্রি.
১০. হিজিরা বর্ষপঞ্জি	—	৬২২ খ্রি.
১১. ইলাহি অব্দ	আকবরের দীন-ই-ইলাহি প্রতিষ্ঠার দিন	১৫৫৯ খ্রি.

(ব্যারাকপুর উ. ২৪ পরগনা)

সংস্কৃত সাহিত্যে দুর্নীতি প্রসঙ্গ : একটি সময়ানুগ পর্যবেক্ষণ

ড. দেবদাস মণ্ডল

অধুনা দুর্নীতি-ব্যক্তি, সমাজ তথা রাষ্ট্রের এক জ্বলন্ত সমস্যা, অত্যন্ত গুরুতর ও স্পর্শকাতর একটি বিষয়। টিভি, খবরের কাগজ, WhatsApp বা ইউটুব খুললেই হেড লাইনে-দুর্নীতি, খুন, ধর্ষণ, হানাহানি কিছু-না-কিছু যেন লেগেই আছে। আদালতের নির্দেশে ভুয়ো গ্রুপ ডি নিয়োগ বাতিল, SSC বা CSC শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি, ভোটে দুর্নীতি, রেশনের চাল চুরি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, কাটমানি, ঘুষ এবং নেতাদের নানা কুকীর্তি, কুমন্তব্যের খবরাখবর শুধু দেখতে দেখতে টিভি বা খবরের কাগজ দেখার ইচ্ছেটাই প্রায় নষ্ট হয়ে গেছে। আসলে দিনে দিনে মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক-বুদ্ধি, চেতনা যেন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। পাশের চেনা মানুষটি যেন হারিয়ে যাচ্ছে কেমন অচেনার অন্ধকারে। মানুষের লোভ, লালসা, হিংসা, মাৎসর্য, পরশ্রীকাতরতা, দিনে দিনে এতই বেড়েই চলেছে যে, সেখানে নীতি-নৈতিকতার কোনো বিন্দুমাত্র স্থান নেই। এই রাজনীতির খেলায় কে বন্ধু? কে শত্রু তা আজ বোঝা বড়ো দায়। আর 'মাস্টারমশাই আপনি কিছু দেখেননি'-র মতোই সবকিছু আমরা হয়তো দেখেও দেখছি না, হয়তো বা বিবেকের দংশনেও মুখে কুলুপ এঁটে বসে আছি, কিংবা একরাশ হতাশায়, আবেগে আর ভারাক্রান্ত মনে ভাবছি - হায়! শেষপর্যন্ত এটাও কী দেখার ছিল বা শোনার ছিল। যাই হোক, আমাদের আলোচ্য যখন দুর্নীতি, আর দুর্নীতি নিয়ে চারদিকে যখন এত কথা সেখানে বিপরীত দিক থেকে একটা প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক যে, সমাজের দুর্নীতি, দুর্বৃত্ত, দুরাচারের সমস্যাটা কী শুধু একালের? না সর্বকালের? অথবা এই সমস্যাটা কী কোনো ব্যক্তিগত, না সমষ্টিগত? এই কৌতূহল থেকেই বর্তমান নিবন্ধের ভাবনা।

দুর্নীতি কী?

এ প্রসংগে বলা যায়, দুর্নীতি হল দুষ্টা নীতি, দুরাত্মার নীতি বা যা ন্যায়নীতির বিরুদ্ধ তাই হল দুর্নীতি। আর নীতি হল[√নী + তি (ক্তিন)] নয়, নয়ন, প্রাপণ, নিয়ম, ন্যায়, শাস্ত্রীয় বিধি, অনুশাসন, উপদেশ, শিষ্টাচার প্রভৃতি। 'নয়নাৎ নীতিরুচ্যতে, বা নয়তি ইতি নীতি।' অর্থাৎ নীতি আমাদেরকে সৎপথে নিয়ে যায়, অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখায়, মৃত্যুর পথ থেকে অমৃতের সন্ধান দেয়। আর দুর্নীতি মানুষকে বিপথে চালিত করে, সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে, মানুষের কুপ্রবৃত্তিগুলিকে ইন্ধন জোগায়। দুর্নীতির আশ্রয়ে মানুষ হয়ে ওঠে স্বার্থকেন্দ্রিক, আপন উদ্দেশ্য সাধনে তৎপর, মানুষের মানবিকতা, মনুষ্যত্ব, বিবেক, বুদ্ধির অবলুপ্তি ঘটে। দুষ্টের ছলের অভাব হয় না, দুরাচারী মানুষের কথায় কাজে আচরণেও কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। *হিতোপদেশ*-এ বলা হয়েছে দুষ্ট বা দুরাত্মার মনে এক, কথায় আর-এক, আর কাজে অন্য - 'মনস্যন্যদ্বচস্যন্যৎ কার্য্যমন্যদ্দুরাত্মনাম্।'[১] অর্থাৎ মনে এক আর কথায় আর-এক। চাণক্যের পরিভাষায় - 'মনসা অন্যৎ বচসা অন্যৎ প্রকাশয়েৎ।' এখন দিনে দিনে পরিবেশ-পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, চারদিকে শুধু দুর্নীতি, দুরাচার, লোকঠকানো আর নেতাদের অনৈতিক কাজকর্মে সাধারণ মানুষ যেন সত্যিই দিশেহারা, নিজেদের জীবন-জীবিকা ভবিষ্যৎ নিয়ে ভীষণ আতঙ্কিত ও বড়ো উদ্‌বিগ্ন।

দুর্নীতির কারণ ও ব্যাপ্তি:

দুর্নীতির কারণ হল—মানুষের সীমাহীন লোভ বা স্বার্থপরতা। বিনা পরিশ্রমে বা বেনিয়মে আপন উদ্দেশ্য সাধনই হল দুর্নীতির মূল উদ্দেশ্য। অদম্য ভোগ-বাসনা পূরণের বাতিক থেকেই মানুষ দুর্নীতির আশ্রয় নেন। দুর্জন ব্যক্তিরা দুর্নীতি ছাড়া চলতেই পারেন না। দুর্নীতির সূত্রপাত ব্যক্তি স্তরের সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের ক্ষেত্র থেকে শুরু হলেও তার কুফল কিন্তু ধীরে ধীরে পরিবার, সমাজ ও সমগ্র রাষ্ট্রের সবাইকেই কমবেশি ভোগ করতে হয়।

দুর্নীতির পরম্পরা অনুসন্ধান করতে গেলে দেখা যাবে তার মূল অনেক গভীরে। সেই সত্য যুগের প্রারম্ভে যখন রাজা, রাজ্য, দণ্ড বা দণ্ডযোগ্য বলে কিছুই ছিল না, সকলে একপ্রকার ধর্মকে অবলম্বন করে পরস্পরকে রক্ষা করত[২] তখন হয়ত সমাজে দুর্নীতি বলে কিছুই ছিল না। তারপর মানুষের চিত্তের বিকারবশত ন্যায় বুদ্ধি লোপ পেতে থাকে, ক্রমে ক্রমে মানুষ লোভ ও মোহের বশবর্তী হলে নীতিধর্ম

বিলুপ্ত হতে থাকে। এভাবে যখন ক্রমশ লোভ, কাম, ক্রোধ, ঈর্ষাদির কারণে অন্যায়ভাবে অলব্ধকে লোভের বাসনা মানুষের প্রবল হয়ে ওঠে, স্বার্থসিদ্ধির বাসনায় একে অন্যের সম্পত্তি গ্রহণে উন্মুখ হয়ে ওঠে, মনে হয় তখন থেকেই সমাজে দুর্নীতির সূচনা। এককথায়, দুরাচারী মানুষের দুষ্ট মনোভাব থেকেই যাবতীয় দুর্নীতির প্রকাশ হয়। মানুষের এরূপ দুরাচারী প্রবৃত্তির কথা উপলব্ধি করেই ব্রহ্মাপুত্র মনু বা মানবজাতির আদি পিতা স্বয়ং মনুই বীতশ্রদ্ধ হয়ে বলেছিলেন-'দুর্লভো হি শুচির্নরঃ'[৩] - অর্থাৎ এই জগতে স্বভাববিশুদ্ধ মানুষ পাওয়া দুর্লভ। একসময় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা ভেবে দুরাচারী মানুষদের দুষ্ট প্রবৃত্তিকে রোধ করতে, তাঁদের ন্যায় পথে প্রবৃত্ত করতে দণ্ড প্রণয়নের প্রয়োজন অনুভব করা হয়েছিল- 'সর্বো দণ্ডজিতো লোকে।' দণ্ডের ভয়েই সমস্ত জগৎ ভোগে সমর্থ হয়।[৪] আর সেই দণ্ডকে সুনিপুণভাবে প্রণয়নের জন্য সমাজে সেদিন প্রয়োজন হয়েছিল বিচক্ষণ রাজার বা শাসকের। আজ রাজতন্ত্রের অবসানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হলেও মানুষের দুর্বুদ্ধির, দুরাচারী প্রবৃত্তির কোনো পরিবর্তন হয়নি, সমাজে দুর্নীতির কোনো অবসান হয়নি বরং বহুগুণে তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সেকাল থেকে একাল পর্যন্ত, দুর্নীতির সেই ট্র্যাডিশন যেন সমানে চলেছে।

উল্লেখ্য, একসময় মানুষের দুর্নীতি দমনের জন্য যে-দণ্ড ('দমনাৎ দণ্ডঃ') বা দণ্ডধর রাজার উদ্ভবের কথা আছে, সেখানে দণ্ডের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে বোঝা যায়, শাসকের দণ্ড যদি কড়া হয়, শাসক যদি বিচক্ষণ হন, অপরাধীর অপরাধ অনুসারে যথাযথভাবে দণ্ডপ্রণয়ন করতে সমর্থ হন তাহলে সমাজে দুর্নীতির প্রভাব কমে যায়, দণ্ডের ভয়ে দুরাচারী মানুষের দুষ্টপ্রবৃত্তির প্রতি ইচ্ছা কিছুটা হলেও প্রতিহত হয়। কিন্তু প্রশাসক যদি দুর্নীতির প্রতি উদাসীন থাকেন, সেগুলিকে 'তুচ্ছ ঘটনা' বলে উপেক্ষা করেন তাহলে দুরাচারী মানুষেরা বেশি বেশি করে দুরাচারে প্রবৃত্ত হবেন - এটাই স্বাভাবিক। তবে একথাও সত্য যে, যে কোনো ক্ষমতাশীল সরকারের দুর্নীতির কথা পাঁচকানে ছড়ায় বেশি। অবশ্য, রাজনীতির অলিন্দে দুরাচারী, দুর্বৃত্ত-লোকজনের ভীড় শুধু একালে নয়, এ যে চিরকালের এক রীতি। মধুলোভী মৌমাছির ন্যায় অর্থপ্রাপ্তির আশায় রাজাকে সবসময় ঘিরে থাকেন বেশ কিছু নীচাশয় ব্যক্তি। স্বার্থের খাতিরে যে কোনো প্রকার হীন কর্ম করতে তারা পিছুপা হন না। দিনে দিনে লোভী মানুষের লোভ, লালসা বৃদ্ধির কারণে দুর্নীতির মাত্রা সমাজে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু রাজতন্ত্র হোক বা গণতন্ত্র, - রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়নের চিত্র সবসময়ই ছিল, তা কখনও কম আর কখনও বেশি। খ্রি. ২য় শতকে *পঞ্চতন্ত্র*-এর মিত্রভেদের একটি গল্পে সে সময়কার রাজবাড়ির অলিন্দে দুর্বৃত্তদের মহাসমারোহের উপস্থিতির কথা থেকে তখনকার রাজ-সরকারের চারপাশে থাকা দুষ্ট মানুষগুলোর স্বরূপ ও অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হয় না। সেখানে দমনক নামক এক দুষ্ট মন্ত্রীর চক্রান্তের শিকার হয়ে রাজা বা রাজবাড়ির প্রতি বীতশ্রদ্ধ সঞ্জীবকের খেদোক্তি - 'মিথ্যে কথাই যাদের পেশা আর নেশা, এমন অভদ্র, কুনেশাগ্রস্ত দুষ্ট লোকে ভর্তি হল রাজবাড়ি, যা সকলের ভয়ের কারণ, তা যেন একটা মহাসমুদ্রের মতো। কিংবা যেন এমন একটা বাড়ি যার মধ্যে লুকিয়ে আছে বহু সাপ, যেন হিংস্র জন্তুতে ভর্তি একটা বন, কিংবা অপরূপ পদ্মশোভায় ভরা একটা সরোবর - যেখানে কিলবিল করছে কুমির।'[৫]

আবার খ্রিস্টপূর্ব যুগেও 'প্রজা সুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম্।' - এই জনকল্যাণমুখী রাষ্ট্রব্যবস্থার ভাবনা যিনি ভেবেছিলেন, সেই মৌর্যসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মহামন্ত্রী কৌটিল্যের আমলেও ভূরি ভূরি দুর্নীতি ছিল, তা জানা যায় কৌটিল্যের *অর্থশাস্ত্র* থেকে। *অর্থশাস্ত্রে* কৌটিল্য ধর্মোপধা, অর্থোপধা, কামোপধা ও ভয়োপধা - এই চারপ্রকার উপধা-প্রয়োগের দ্বারা রাজকর্মচারীদের বুদ্ধির শুদ্ধি পরীক্ষার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উক্ত উপধাগুলির মধ্যে *অর্থোপাধা*-র হল-রাজকর্মচারীদের আর্থিক দুর্নীতি জানার প্রকৃষ্টতম উপায়। অর্থাৎ *অর্থোপধা*-র প্রয়োগে বা আর্থিক প্রলোভন দেখিয়ে কোনো কর্মচারী অন্যায়ভাবে অর্থের লোভে অনৈতিক কর্মে প্রলুব্ধ বা ইচ্ছুক হচ্ছেন কিনা তা জানা যেত। ঠিক এখনকার যুগের নেতা-মন্ত্রী, সরকারি কর্মচারীদের সামনে যেমন মাঝে মাঝে বিশেষকার্য সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রচুর অর্থ দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়, আর তাতে লোভ সামলাতে না-পেরে তাঁরাও যেমন কখনও-সখনও কাগজে মুড়ে কিংবা রুমালে মুড়ে ওই টাকায় হস্তক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করেন না, তখনকার রাজকর্মচারীরাও আর্থিক প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে এরূপ টাকা ঘুষ নিতেন, হয়ত বা এখনকার মতোই তাঁরাও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে উচ্চহারে অর্থের দাবিও করতেন, যা জানা যেত ওই ধরনের উপধা প্রয়োগের ভিত্তিতে।

ধর্মশাস্ত্র বা অর্থশাস্ত্র নিয়ে চর্চা করলে দেখা যায় - তখনকার সময়ের রাজ-সরকারের উচ্চপদস্থ মন্ত্রী, অধ্যক্ষ, রাজার প্রিয় পাত্র-মিত্র থেকে শুরু করে রাজার অনুগত প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সকলেই কমবেশি দুর্নীতির দায়ে যুক্ত। *মনুসংহিতা*-য় এবং কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র-এদের বলা হয়েছে - উৎকোচকাঃ, প্রবঞ্চকাঃ, আজকের পরিভাষায় - তোলাবাজি, তোলাবাজ, ঠকবাজ। যাঁরা কার্যার্থী ব্যক্তির নিকট ঘুষ নিয়ে অন্যায় অযৌক্তিক কাজটি সহজে করে দেন। অন্যায়ভাবে মালপাচার হোক, কূটদলিল প্রস্তুত হোক, মিথ্যাসাক্ষ্যদান বা টাকার বদলে অন্যায়ভাবে যে কোনো কর্ম সম্পাদন, রাস্তায় গাড়ি আটকে টাকা নেওয়া-এসব কিছু সেকাল থেকে একাল, সর্বত্রই আছে। রাজ-সরকারে থেকে উৎকোচ গ্রহণ, রাজদ্রব্যের অসম বণ্টন, স্বজনপোষণ, রাজকর্তব্যের প্রতি অবহেলা, অবিবেচক মানসিকতা, দুর্নিবার ভোগের ইচ্ছাই হল দুর্নীতিদুষ্ট মন্ত্রী বা রাজকর্মচারীদের সর্বকালের বৈশিষ্ট্য।

এসব দুর্নীতিবাজ বা তোলাবাজ লোকজনদের প্রতি অধ্যাপক নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ীর মন্তব্য - 'আজকাল আমাদের শহর-গ্রাম-আধা শহরে এলাকাভিত্তিক রাজত্ব করেন, তোলাবাজ' নামে এক বিচিত্র মানবাংশ। এরা সরাসরি রাজনৈতিক দলের লোক, কখনও বা রাজনীতির মদতে পুষ্ট, এরা বিভিন্ন ভয় দেখিয়ে টাকা আদায় করেন মানুষের কাছ থেকে।' অধ্যাপক ভাদুড়ি - 'উৎকোচাঃ' শব্দের পাশাপাশি 'ঔপধিকঃ' শব্দের অর্থ নিরূপণ কালে এবং মনুর টীকাকার কুল্লুকভট্টের মতো উদ্ধৃত করে বলেছেন যে, 'ঔপধিকঃ' - হল সেই ধরণের প্রবঞ্চক, যারা ভয় দেখিয়ে পরধন হরণ করেন এবং সেই ধনেই জীবিকানির্বাহ করেন। অতি প্রাচীন কালেও যে এই ধরনের ত্রাস সৃষ্টিকারী মানুষের অভাব ছিল না তা মনুসংহিতায় 'ঔপধিকঃ'- শব্দটার প্রয়োগ থেকে বোঝা যায়।' লক্ষণীয় মনু সেইসময়েও চিকিৎসক বৈদ্যদেরও এইধরনের প্রকাশচোর বা প্রবঞ্চকদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আজকালে প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলির ওযুধের বিল বা অযথা বিদ্যুৎ বিল বৃদ্ধিতে বা চাকরি দেওয়ার নাম করে প্রচুর অর্থ অপহরণ, অল্পসময়ে বিনিযুক্ত সামান্য-অর্থের মহৎ-সমৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ অপহরণ-রূপ চিটফান্ড প্রভৃতিতে আর্থিক দুর্নীতির ছাপ সুস্পষ্ট।

আর্থিক দুর্নীতি হল :

বেনিয়মে অর্থ নেওয়া-উৎকোচ গ্রহণ বা প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ তছরূপ করা। 'অর্থদূষণম্ অর্থানাম অপহরণম দেয়ানাম অদানম' - অর্থাৎ রাজকোষে জমা পড়া অর্থের নয়ছয়, যে-অর্থ যাকে দিতে হবে সেই অর্থ পুরোটা তাকে না-দিয়ে নিজে তার থেকে কিছুটা আত্মসাৎ করা। দ্রব্যের অসম বণ্টন, স্বজনপোষণ অথবা জনকল্যাণের জন্য বরাদ্দ অর্থ পুরোটা কাজে না-লাগিয়ে তার থেকে কাটমানি বা কিছু টাকা নিজের পকেটজাত করা - এসব কিছুই সেযুগেও ছিল এযুগেও আছে। দুর্নীতিগ্রস্ত রাজকর্মচারী বা মন্ত্রীদের দ্বারা রাজ্য পরিচালিত হলে জনগণ রাজ-সরকারের প্রতি বিরাগভাজন হন। নীতিহীন রাজার রাজ্য অচিরেই বিনষ্ট হয়। অর্থশাস্ত্রের 'জনপদনিবেশ' - এই অধ্যায়ে কৌটিল্যের পরামর্শ হল - রাজবল্লভ, রাজার কর সংগ্রহকারী কর্মচারী, চোর, অন্তপাল ও পশুসংঘ দ্বারা পীড়িত বণিকপথ শুদ্ধ বা মুক্ত রাখবেন।[৬] এখানে বণিকপথ বলতে বোঝানো হয়েছে বাণিজ্যপথ, কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য - এই ছিল তখনকার যুগের মানুষের জীবিকার, অর্থোপার্জনের অন্যতম ব্যবস্থা। আর এই তিনটি ক্ষেত্রেই কখনও রাজার প্রিয়পাত্রদের দ্বারা (বল্লভৈঃ), কখনও রাজার করসংগ্রহকারী কর্মচারীদের দ্বারা (কার্মিকৈঃ), কখনও-বা চোরদের দ্বারা (স্তেনৈঃ) - প্রকাশ্য চোরদের (আজকের যুগে তোলাবাজদের) দ্বারা বা ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা ঘটত। অর্থাৎ অনেক সময় ওই সমস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত মানুষেরা কৃষিকার্য, পশুপালন, ব্যাবসাবাণিজ্যের ক্ষেত্রে গিয়ে জোরপূর্বক কৃষক, পশুপালক বা বণিকদের কাছ থেকে কর গ্রহণের নামে সময় সুযোগ বুঝে অযৌক্তিক হারে টাকা তুলতেন বা অযথা হারে অর্থের দাবি করতেন, ফলে উপযুক্ত লাভ না-পেয়ে কৃষক, পশুপালক কিংবা বণিকদের কৃষিকার্যে, পশুপালনে বা বাণিজ্যে অনীহা দেখা দিল। এরপর ছিল রাজার প্রিয়পাত্রের প্রচুর অর্থের দাবি,তারপর প্রকাশ্য চোর (তোলাবাজ), গুপ্তচরদের উপদ্রব। এইসব সংকটে পড়ে বণিকদের বাণিজ্যেও ভাটা পড়ত, ঠিক যেমন আজকের যুগে প্রচুর রাজবল্লভ পুরুষদের অর্থাৎ সরকারের প্রিয়পাত্র বা অনুগত প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তোলা তোলার চাপ বা অযৌক্তিক হারে অর্থের দাবির ফলে শিল্পপতিদের শিল্পে বা ব্যবসায়ীদের ব্যাবসায় অনীহা দেখা যায়। তবে তখনকার সংগে এ যুগের পার্থক্য হল - তখন যেমন কৃষিকর্ম, পশুপালন বা বাণিজ্যকর্ম রাজবল্লভ,

কার্মিক, চোর, অন্তপাল প্রভৃতি ব্যক্তির দ্বারা যাতে কোনো কোনো প্রতিবন্ধক না-হয়, রাজাকে তাঁর প্রতিবিধান করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন যদি রাজ-সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা কর্মচারীদের নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার প্রবণতাকে এই ধরনের তোলবাজি, দুর্নীতিগুলিকে উপেক্ষা করেন, কিংবা দলের শ্রীবৃদ্ধি অর্থে তাঁদেরকে দুর্নীতিকর্ম থেকে নিবারিত না-করেন বা দুর্নীতি প্রমাণিত হলে উপযুক্ত শাস্তি না-দিয়ে উদাসীন থাকেন তাহলে সমাজে তথা রাষ্ট্রে (কৃষকদের দ্রব্য সামগ্রীর অনুৎপাদন বা বাণিজ্যে বা শিল্পে দ্রব্যের পর্যাপ্ত বিনিয়োগ বা লেনদেনের অসুবিধায়) একদিকে অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয় তেমনি অন্যদিকে দুরাচারীদের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পায়।

দুর্নীতি দমনের প্রশ্নে :

মনে করা হয় সেযুগের আইনের শাসনটা একটু কড়াই ছিল। দুর্নীতি প্রমাণিত হলে সেই কর্মচারীকে হত্যার কথাও বলা হয়েছে।[৭] *মনুসংহিতা*-য় আছে - যদি কেউ ছলচাতুরী করে কারও দ্রব্য অপহরণ করেন তাহলে তাঁকে এবং তাঁর সাহায্যকারী ব্যক্তিকে বিচিত্র পদ্ধতিতে বধ করা রাজার কর্তব্য।[৮] দুরাচারী মন্ত্রীদেরকে *হিতোপদেশ*-এ ভৃত্যাধম বা অপরাধী বলে নির্দেশ করে অবিলম্বে তাদের ত্যাগ বা দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। জলের মধ্যে থাকা মাছেরা যেমন ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় জলপান করে ফেলে তেমনি প্রভূত অর্থও ক্ষমতার মধ্যে বিরাজ করে নেতা, মন্ত্রীরা আর্থিকদুষ্ট হবেন, এটাই স্বাভাবিক। যাঁরা অনৈতিক উপায়ে অর্থ গ্রহণ করতেন এহেন ব্যক্তিদের থেকে অর্থ উদ্ধারের জন্য *হিতোপদেশ*-এর উপদেশ হল - দুরাচারী কর্মচারীরা হল দুষ্টব্রণের মতো। গামছাকে যেমন বারবার নিঙড়ালে তার থেকে জল বের হয় তেমনি আর্থিকদোষে দুষ্ট অমাত্যদের বরাবর পীড়নের মাধ্যমে তাঁদের আত্মসাৎকৃত অর্থ উদ্ধার করা উচিত।[৯] কৌটিল্যের আমলে দূতেরাও যাতে আর্থিকভাবে দূষিত না-হয়ে পড়েন বা প্রলোভিত বা দুর্নীতিগ্রস্ত না-হন, সেজন্য বিদেশে দূত বা চর প্রেরণকালে সেই চর বা দূতকে নজরে রাখার জন্য আর-এক জন গুপ্তচরকে নিয়োগ করা হত।

মানুষের অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কুপ্রবৃত্তি, কুনেশা থেকে সমাজে দুর্নীতির প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এখন অনেকে এমন আছেন যাঁরা হয়তো কোনোক্রমে বিদ্যালয়ের গণ্ডি পার হয়েছেন বা হননি বা যাদের গোরু পাচার, বালির খাদানে তোলা তুলে কিংবা রোয়াকের মস্তানিগিরি করে দিন কাটানোর কথা ছিল - তাঁরা যেমন আজ ভোটবৈতরণী পার হয়ে অনায়াসে নেতা, মন্ত্রী হতে পারেন, তখন কিন্তু প্রাচীন ভারতীয় রাজশাস্ত্রগুলিতে রাজা, মন্ত্রী হতে গেলে বিবিধগুণরাজি ও আন্বীক্ষিকী, (সাংখ্য, যোগ, লোকায়ত এই ত্রিবিধ দর্শন বিষয়ে জ্ঞান) ত্রয়ী, বার্তা, দণ্ডনীতি বা নীতিশাস্ত্রীয় বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী হতে হত, তার পরেও তাঁদের উপর চলত নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা। কারণ, রাজতন্ত্রের শিথিলতা, বাস্তব পরিবেশ পরিস্থিতিতে নেতা, মন্ত্রীরা প্রলুব্ধ হয়ে উঠতে পারেন - এটাই বাস্তব। অনেক সময় রাজা বা রাজ-সরকার নিজে যদি আর্থিক দিক থেকে অস্বচ্ছ হতেন তাহলে মন্ত্রীরাও আর্থিকভাবে করাপটেড হয়ে পড়তেন বেশি করে। এই প্রসংগে/কৌটিল্যের একটা মন্তব্য হল -- 'স্বয়ং যচ্ছীলাঃ তচ্ছীলাঃ প্রকৃতয়ো ভবন্তি।' অর্থাৎ রাজা যেমন চরিত্রের হবেন, তাঁর মন্ত্রী, অমাত্য, সচিবেরাও তেমন প্রকৃতির হবেন। এখন রাষ্ট্রের শাসক যদি অন্ধ হন, তিনি সবকিছু দেখেও না-দেখার ভান করেন, নিজের প্রিয়পাত্র বা অনুগত কর্মচারীদের অন্যায় দেখা সত্ত্বেও কিছু ব্যবস্থা না-নেন, তাহলে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রজাদের দুর্গতির কোনো সীমা থাকে না।

মহাভারত-এ ন্যায়াচারী যুধিষ্ঠির হস্তিনাপুরের সিংহাসনে যোগ্যাধিকারী হওয়ার সত্ত্বেও পুত্রস্নেহে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সর্বদাই চেয়েছেন তাঁর পুত্র দুরাচারী, দুর্যোধন রাজা হোক। পাণ্ডবদের প্রতি দুর্যোধন অন্যায় করছেন রাজা ধৃতরাষ্ট্র সবই জানেন, বোঝেন কিন্তু তিনি তাঁর কোনো শোধরাবার ব্যবস্থা করেননি। বরঞ্চ দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্যোধনের দুর্বুদ্ধিযুক্ত সমস্ত কার্যকেই মেনে নিয়েছেন বা সমর্থন করেছেন। তা সে পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তীকে বারণাবর্তের জতুগৃহে পুড়িয়ে মারার চক্রান্ত হোক, বা জতুগৃহে পাঠানোর ক্ষেত্রে পাণ্ডবদের অনুগত মন্ত্রী, অমাত্য, জনগণেরা যাতে বিদ্রোহী না-হয়ে ওঠেন সেজন্য তাঁদের প্রচুর পরিমাণে অর্থ দিয়ে কিনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত (-'অর্থমানেন পুজিতাঃ। ... ধ্রুবম্ অস্মৎসহায়াস্তে ভবিষ্যন্তি প্রধানতঃ।) হোক, অথবা দুর্যোধন কর্তৃক শৈশবে ভীমবকে বিষ প্রয়োগ করে মারার চক্রান্ত হোক, কিংবা শকুনির কপট পাশায় পাণ্ডবদের হারিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হোক, এসব দুরভিসন্ধির পিছনেও ধৃতরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন মদত ছিল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ 'ধর্মযুদ্ধ'

হিসেবে অভিহিত হলেও সেখানেও দুই পক্ষই নিজেদের জয়ের জন্য যে কতরকম দুর্নীতি ও ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল তা কারও অজানা নয়। তা সে অর্জুন পুত্র অভিমন্যু বধ বা অর্জুন কর্তৃক কর্ণ বধ বা কৃষ্ণের মায়াজালে জয়দ্রথ বধ হোক অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মের সামনে শিখণ্ডীর উপস্থিতিতে ভীষ্মের অস্ত্র ত্যাগ, আর ধর্মরাজা যুধিষ্ঠিরের - 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজ' ইত্যাদি কূটকৌশলী মন্তব্য হোক বা কীভাবে গদাযুদ্ধে ভীম দুর্যোধনকে পরাজিত করেছিল এসব ঘটনা সকলের জানা। সেখানে ধর্মচক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের কথাও বা বাদ যায় কেন! যিনি নাকি ধর্মসংস্থাপনের জন্য বারবার নিজেকে সৃষ্টি করার কথা বলেছেন, তাঁর নানা দুর্নীতি আর মিঠে বজ্জাতির কথাও কী কম কিছু আছে? অবশ্য, তিনি স্বীকার করেছেন ধর্মসংস্থাপন বা অর্থাৎ বৃহত্তর স্বার্থেই নাকি তিনি ওইসব অল্পদুষ্ঠামিযুক্ত কর্মগুলি সম্পাদন করতে বাধ্য হয়েছেন।

আদর্শ রাষ্ট্র বলতে তো আমরা রামরাজ্যের কথা বলি। সেখানেও কি মিথ্যাচার, দুর্নীতি কম ছিল না কী? সেই মন্থরার কূটনীতি বা কুপরামর্শে রামের চোদ্দোবছর বনবাস, মায়াবী রাবণের সোনার হরিণের ছদ্মবেশ বা ভিখারির ছদ্মদেশে দিগ্‌বিজয়ী বীর রাবণের সীতাহরণ (পরস্ত্রীর প্রতি বলাৎকার), অন্যায়ভাবে রাজা রামের বালীবধ বা শুদ্র হয়ে তপস্যা করার অপরাধে শম্বুক বধ বা অধর্মের দোহাই দিয়ে লঙ্কারাজ রাবণের পক্ষ ত্যাগ করে বিভীষণের রামের শরণাপন্ন হওয়া (ঠিক যেমন আজকের যুগে মানুষের জন্য কাজ করতে না-পারার অভিযোগে বা নির্দিষ্ট দলে থেকে দমবন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয়ে কিংবা বিবেকের তাড়নায় (নিজেদের আখের গোছানোর ধান্দায়) নেতারা দল পালটে অন্যদলে যান) — সর্বত্রই দুর্নীতির ছাপ সুস্পষ্ট।

আজকাল অর্থ আর স্বার্থ ছাড়া নেতা মন্ত্রীদের কোনো পাত্তাই পাওয়া যায় না। একসময় নেতারা যথাসম্ভব নীতির পথ অনুসরণ করে চলতেন, মানবকল্যাণে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতেন, আর এখন নেতারা দুর্নীতির পুতগন্ধ থেকে উদ্ভূত হয়ে যেন দেশটাকে চরম অন্ধকারে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা ভোটের আগে এক ভোটের পরে অন্য। পুরো ভোলটাই যেন তাঁদের বদলে যায়। স্বার্থের খাতিরে যে-কোনো হীন কাজ করতে তাঁরা পিছুপা হন না। কথায়, কাজে, আচরণে তাঁদের কোনো সংগতি নেই। জনগণকে ধোঁকা দিয়ে রাজক্ষমতা লাভই হল তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য। দেবতা বা ধর্মের দোহাই দিয়ে, ডাহা মিথ্যে কথা বলে জনগণকে ঠকিয়ে কীভাবে রাজা হওয়া যায় এবং তার পরিণতি কী হতে পারে এর দৃষ্টান্ত *পঞ্চতন্ত্র*-এর 'নীলবর্ণশৃগাল'-এর একটি গল্প থেকে বোঝা যায়।

আলোচ্য গল্পে শৃগালের নাম চণ্ডরব। চণ্ডরব বলতে যেমন বোঝায় - যার গলার স্বর বা আওয়াজ প্রচণ্ড, বা উগ্র আওয়াজ। এখন কথাকারের এই শৃগালের নাম চণ্ডরব দিলেন কেন সেটা একটু ভাবনার বিষয়। কারণ, বাঘ বা সিংহের গলার আওয়াজ তো কম কিছু নয়, সেখানে একটা সামান্য শেয়ালের নাম চণ্ডরব। হয়তো নিরন্তর চিৎকার, চেঁচামেচির কারণে তার এইরূপ নাম হতে পারে। যাইহোক, শেয়াল ছিল খুব লোভী ও হ্যাংলা, খাওয়ার লোভে সে ঢুকেছিল এক শহরের মধ্যে। শহরে ঢুকতে-না-ঢুকতেই শহুরে কুকুরগুলো ঘেউ ঘেউ করে তাকে তাড়া করে। কুকুরদের তাড়া খেয়ে প্রাণের ভয়ে পালাতে গিয়ে সেই শেয়ালটি এক ধোপার নীলভরতি গামলায় পড়ে যায় এবং তার সমগ্র অঙ্গে নীলবর্ণ প্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় কুকুরেরা হয়তো তাকে শেয়াল বলে চিনতে না-পেরে যে যার মতো চলে যায়, এমনকী শেয়ালও যেন নিজেকে নিজে যেন চিনতে না-পেরে বনের দিকে রওনা হয়। এবার বনে যেতে-না-যেতেই তার মতো অদ্ভুত প্রাণীকে দেখে ভয়ে বনবাসী বাঘ, চিতা, নেকড়ে প্রভৃতি পশুরা ইতস্তত পালাতে থাকে। তাকে দেখে বড়ো-ছোটো পশুদের এমন ভয় পাওয়া বুঝতে পেরে ধুরন্ধর শেয়ালটি ফন্দি খাটিয়ে বলে - 'ওহে বনের পশুরা আমাকে দেখে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, এই বনে পশুদের কোনো রাজা নেই দেখে স্বয়ং ব্রহ্মা আমাকে সৃষ্টি করে এই বনের রাজা হিসেবে অভিষিক্ত করে পাঠিয়েছেন।' একে তো মহাদেবের কণ্ঠের মতো নীলবর্ণ সেই শেয়াল, তার উপর সে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট বা প্রেরিত - এইসব কথা শুনে সিংহ, বাঘ সমস্ত হিংস্র প্রাণীরা - 'হুজুর আদেশ করুন' এই বলতে বলতে তার চারদিকে ভীড় জমায়। শেয়ালটিও তখন সিংহকে মন্ত্রীর পদ, বাঘকে শয্যাপাল, চিতাকে পানের দপ্তর (অভ্যর্থনায়), নেকড়েকে দারপাল আর সমস্ত শেয়ালদের সংগে কোনো বাক্যালাপ না-করে তাঁদের তাড়িয়ে দেয়। এভাবে বাঘ, সিংহরা পশু শিকার করে তার সামনে আনে, রাজা নীলবর্ণ শেয়ালও সবাইকে ভাগবাঁটোয়ারা করে দিয়ে নিজের উদরপূর্তি করে, এভাবে রাজত্ব চলছিল বেশ। চলতে চলতে একদিন বিপত্তি হল, যখন একদিন পাত্রমিত্র ভরা সভায় বসে

থাকা অবস্থায় দূর থেকে একপাল শেয়ালের ডাক শুনতে পায়, তখন মনের অজান্তে শিহরিত হয়ে সভায় দাঁড়িয়ে উঠেই সে তারস্বরে ডাকতে শুরু করে। তার চিৎকার শুনে বাঘ-সিংহরা শেয়ালের চাটুকারিতার কথা বুঝতে পারে এবং মুহূর্তেই তারা সেই নীলবর্ণ শেয়ালের বিনাশ ঘটায়।

এখানে আমাদের মনে হতে পারে, আজকালকার রাজনৈতিক নেতারা আপন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অর্থাৎ প্রজাদের কাজে নিজের ধর্মীয় ইমেজ বৃদ্ধির জন্য যেমন নিজেদের কোনো-না-কোনো বিশেষ দেবতার অনুগত বা বিশেষ কোনো ধর্মের অনুগত বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকেন ঠিক তেমনি এইগল্পের নীলবর্ণ শেয়ালটি বনের পশুপ্রজাদের কাছে নিজেকে ব্রহ্মার সৃষ্ট বলে উল্লেখ করেছে, সেকারণে পশুপ্রজাদের কাছে শেয়ালের একটা গুরুত্ব বা কদর পেয়েছে। হয়তো সেটা ঠিকই, কিন্তু শেয়ালটি রাজাহীন বনে নিজেকে ব্রহ্মার দ্বারা সৃষ্ট বলে উল্লেখ করার মাধ্যমে সে আসলে মনু রাজধর্মের বা রাজাসৃষ্টির মূল কথাই সে গল্পের ছলে পশুপ্রজাদের কাছে নিবেদন করেছে। রাজাসৃষ্টির কারণ প্রসঙ্গে মনু বলেছেন - 'অরাজক এই জগতে যখন প্রবলের ভয়ে দুর্বলেরা ইতস্তত পালিয়ে যাচ্ছিল তখন এই জগতের সবকিছু সুরক্ষার জন্য প্রজাপতি প্রভু (ব্রহ্মা) রাজাকে সৃষ্টি করেছিলেন।'[১০] এখানেও কিন্তু দেখা যায়, বনরাজ্যে পশুপ্রজাদের রাজাহীনতার কথাও যেমন আছে তেমনি নীলবর্ণ শেয়ালটিকে দেখে (অজানা পশুর ভয়ে) সমস্ত পশুদের ইতস্তত পালিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গও আছে। ফলত পশুপ্রজাদের সুরক্ষার জন্য ব্রহ্মার দ্বারা তার বনরাজ্যে অভিষেক হয়েছে। যেহেতু মনুর মতে রাজা পরমেশ্বর দ্বারা সৃষ্ট এবং ইন্দ্রাদিদেবতার সারভূত অংশ নিয়ে রাজা সৃষ্ট তাই রাজার বয়স, আকার বা আকৃতি এসব কিছু বিবেচনার কোনো প্রয়োজন নেই। বালক হলেই তাঁকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়, রাজা হলেন মানুষরূপে মর্ত্যে একজন মহান দেবতা। 'বালোহপি নাবমন্তব্যো মনুষ্য ইতি ভূমিপঃ।'[১১] আলোচ্য গল্পে নীলবর্ণ শেয়ালটি খুব জেনে-বুঝেই ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে নিজেকে যেমন ব্রহ্মার সৃষ্ট বলেছে, তেমনি তার নীল রংটি শিবের নীলকণ্ঠের সংগে খুব মিলে গেছে, তাই তার কথা শুনে বা তাকে দেখে বাঘ, সিংহাদি পশুরা অপেক্ষাকৃত বলবান হওয়ার সত্ত্বেও শেয়ালের যাবতীয় বক্তব্যকে নির্বিবাদে মেনে নিয়েছে। স্বজাত শেয়ালেরা তাকে যেন শেয়াল বলে চিনতে না-পারে সেজন্য সে অনতিবিলম্বে স্বজাত শেয়ালদের রাজসভা থেকে দূরে তাড়িয়েছে। ধূর্তামি করে চলছিল বেশ ভালোই। কিন্তু কথায় আছে চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কার্য সিদ্ধ হয় না, বা হলেও তার ফল বেশিদিন ভোগ করা যায় না। এখানেও দেখা যায়, শেয়ালটির চাটুকারিতা যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, এমন সময় একদিন অন্যান্য শেয়ালদের ডাক শুনে চণ্ডরব আর নিজেকে ঠিক রাখতে না-পেরে, আবেগে আত্মহারা হয়ে স্বাভাবিক গলায় চিৎকার শুরু করে দেয়, তখন তার ধূর্তামির প্রকাশ ঘটে এবং অচিরেই বাঘ-সিংহ প্রভৃতিরা তার বিনাশ ঘটায়। বস্তুত, এখানে গল্পের ছলে এটাই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে যে, উপযুক্ত সামর্থ্য ছাড়া দৈবপ্রভাবে, ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগিয়ে বা ছলনার আশ্রয় নিয়ে, কিংবা মিথ্যে কথা বলে সাময়িক-ভাবে রাজা হলেও তার স্থায়িত্ব সমাজে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। শুধু তাই নয়, প্রজাসাধারণের সংগে প্রতারণা করার ফলে প্রতারক রাজার বিনাশ (জীবনহানি) পর্যন্তও ঘটতে পারে তা নীলবর্ণ শেয়ালের অন্তিম পরিণতি থেকে সহজে উপলব্ধি হয়।

আধুনিক সংস্কৃত সাহিত্যেও দুর্নীতির বর্ণনা পাওয়া যায় - দীপক ঘোষের *রাজনীতিলীলামৃ* (১৯৯৯), রাজনীতিকে নমস্কার করে এই কাব্য শুরু হয়েছে। সেখানে বর্তমান সময়ে রাজনীতির এক নগ্ন রূপ বর্ণিত হয়েছে। রঙ্গনাথ শর্মার *একচক্রম্* - এই নাটকে রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, স্বার্থপরতা এবং সমাজের চিরন্তন সমস্যা সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন নাট্যকার। শ্রীজীব ন্যায় তীর্থের *চৌর-চাতুরীয়ম্* - এই প্রহসনে একচোরের গল্পের মাধ্যমে দেখা যায় যে, সাধারণ চোর সে হয়তো শাস্তি পায়, কিন্তু অনেক বড়ো বড়ো চোরেরা বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় বা বিদেশ পালিয়ে যায় তাদের কোনো শাস্তি হয় না। সেখানে ব্যবসায়ী, কুটরাজনৈতিক নেতাদের অভ্যুদয় ও বিরাট রমরমা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের প্রকাশ চোর হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এরূপ দুর্নীতি তথা হিংসা, দ্বেষ প্রভৃতি বিষয় অবলম্বনে সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের রচিত *স্বর্গীয়হসনম্* (১৯৭৭)-এই নাটকে মন্ত্রী, সাংসদ এবং রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি, ক্ষমতার লোভ, চক্রান্ত, অর্থ-সুরা-নারীর ব্যবহারে দল ভাঙার প্রচেষ্টা, সম্প্রীতির নামে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি বাস্তব সমাজের সবকিছুই অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সিদ্ধেশ্বরের 'অথ কিম্' নাটকে কবি

সূত্রধারের বক্তব্যের মাধ্যমে বর্তমান দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থার উলঙ্গ চেহারার সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন। এছাড়া লক্ষ্মীকান্ত পঞ্চতীর্থের *বাণীদূত* নামক গীতিকাব্যে দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত অধ্যাপকের কথা আছে। তারাপদ ভট্টচার্যের *বিষমপ্যমৃতম্, অথ ভেজাল কথা*-য় (২০০৪) আধুনিক জীবনযাত্রায় ভেজাল সর্বস্বতা, দ্বিচারিতা, ভণ্ডামি, দুর্নীতির প্রকৃষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়।

দুর্নীতি, ছলনা, মিথ্যাচার নিয়ে বহু কথা বলা যায়, নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির কথা মাথায় রেখে এবার বিরতির দিকে যেতে হবে। তবে মানুষের প্রতি মানুষের দুর্নীতি বা ছলনা, মিথ্যাচার সত্যিই নিন্দনীয় ঠিকই, কিন্তু অন্যদিক দিয়ে ব্যাপারটা একটু ভাবা দরকার। ধরুন, এসব দুর্নীতি, দুরাচার, কুকীর্তি যদি সমাজে না-থাকত, সবকিছুই একটানা নৈতিকতার পথে সবকিছুই ভালোভাবে চলত তাহলে কী সমাজটা কেমন একটা জোলো, একঘেয়েমির বিষয় হয়ে পড়ত না? যদি কোনো কাহিনিতে ভিলেন বা খল না-থেকে শুধুই নায়কই থাকে তাহলে তা আমাদের কেমন লাগত? ভাবুন তো মন্থরা ছাড়া রামায়ণের কাহিনি বা শকুনি ছাড়া মহাভারত! পাশাখেলা না-হলে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণটা কী হত আদৌ? হত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ কোনো দিন? এইবার কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ছাড়া মহাভারতকে যদি ভাবা যায়, কেমন লাগবে? সর্বদা ন্যায়-নীতি, সত্যকে অবলম্বন করলে জগতে কারও সঙ্গে কোনো সংঘাতই কি থাকত কখনও? আর দুর্নীতি না-থাকলে নীতির গুরুত্বটা কি সত্যি বোঝা সম্ভব হত? না, তার মানে এই নয়, যে আমরা দুর্নীতির পক্ষে, আমরা শান্তি চাই না যুদ্ধ চাই, অহিংসা নয় হিংসা চাই, কিন্তু সমাজের এই দুর্নীতি, দুঃখ, খারাপ দিকগুলো আছে বলেই হয়তো মানুষ নীতিপথে ভালো হয়ে বাঁচার আনন্দ পায়, যত প্রকার অশান্তি কাটিয়ে উঠে পরম শান্তি অনুভব করে। আর সে কারণেই যাবতীয় কাহিনি, সমস্ত ঘটনা বা সব সাহিত্য - সর্বত্রই সুনীতি-দুর্নীতি বা ভালো-মন্দ, সুখ-দুঃখের সহাবস্থান এক অনিবার্য সত্যরূপে স্বীকার্য। অর্থাৎ দুর্নীতির দৌলতে যেন জাগতিক সবকিছু একটা নান্দনিক ব্যাপার হয়ে ওঠে। তবে হ্যাঁ, দুর্নীতির শিকার হলে যে কারও মনটা একটু ভারাক্রান্ত হয় বটে, কিন্তু 'মধু তিষ্ঠতি জিহ্বাগ্রে হৃদয়ে তু হলাহল' এই সব ছলনাময় দুরাচারী মানুষ ছাড়া সমাজের জীবন্ত সত্তাটাই যেন উপলব্ধি করা যায় না। আর সত্যিকথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে, মানুষ হিসেবে এই সব ভালো-মন্দ, ন্যায়-নীতি-ছলনা, দুর্নীতি, সত্য-মিথ্যার অনুভূতি বা প্রবণতা আমাদের সকলের মধ্যে কমবেশি কিছু-না-কিছু তো আছেই, আর থাকাটাই স্বাভাবিক। তবে কোনোটির আশ্রয় কখন নিতে হবে বা কতটা নিতে হবে - সেটা মনে হয় বুঝেসুঝে ঠিক করে নেওয়াই ভালো, শুধু বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা উচিত - কাজটি শুধু ব্যক্তিস্বার্থসিদ্ধির জন্য করছি না সমষ্টির কল্যাণে? তবে আমরা সুস্থবুদ্ধির মানুষ সকলেই চাই পৃথিবীটা আরও সমৃদ্ধ হোক, সমস্ত মানুষের সৎ, শুভ বুদ্ধির উদয় হোক, সকলেই সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজ করুন। আমাদের মন থেকে সমস্ত হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, দুর্বুদ্ধি, দুশ্চিন্তা, ক্ষুদ্রস্বার্থগুলি অপসারিত হোক। আমরা সকলে সমবেতভাবে যাবতীয় প্রতিকূলতা কাটিয়ে এক সুন্দর পৃথিবীর স্বপ্ন দেখি —

'সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ। সর্বে সন্তু নিরাময়াঃ/ সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু। মা কশ্চিৎ দুঃখভাগভবেৎ।।'

ওঁ শান্তিঃ। শান্তিঃ। শান্তিঃ।

(যাদবপুর, কলকাতা)

তথ্যসূত্র ঃ

১. *হিতোপদেশ*, ১.১০২
২. ন বৈ রাজ্যং ন রাজাহহসীন্ন চ দণ্ডো ন দাণ্ডিকঃ।
ধর্মে নৈব প্রজাঃ সর্বা রক্ষন্তি স্ম পরস্পরম/ *মহাভারত*, ১২.৫৮.১৪
৩. *মনুসংহিতা*, ৭.২২
৪. তদেব৫. পঞ্চ, ১.৩৭৯
৬. 'বল্লভৈঃ কার্মিকৈঃ স্তৈনৈরন্তপালৈশ্চ পীড়িতম্।
শোধয়েৎ পশুসংঘৈশ্চ ক্ষীয়মানং বরিক পথম।।' ২.১.৩৮
৭. সাধূন্সমানয়েদ্রাজা বিপরীতাংশ্চ ঘাতয়েৎ।
যাঞ্জবল্ক্যসংহিতা, ১.৩৩৮
৮. *মনুসংহিতা*, ৮.১৯৩
৯. *হিতোপদেশ*, ২.১০৪
১০. *মনুসংহিতা*, ৭.৩
১১. বালোহপি নাবমন্তব্যো ইতি ভূমিপঃ।
মহতী দেবতা হ্যেষ্যা নবরূপেণ তিষ্ঠতি। *মনুসংহিতা*, ৭.৮

চিঠিপত্তর

সম্পাদক সমীপেষু:

'নিবেদন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার মতো দ্বিতীয় সংখ্যাটি ও পড়ার সুযোগ হল। দ্বিতীয় সংখ্যাটি উৎকর্ষে আরও সুন্দর হয়েছে। প্রচ্ছদও বেশ মার্জিত এবং সুষ্ঠ সাহিত্য চেতনার ইঙ্গিত বহন করে। দ্বিতীয় সংখ্যায় কবিতা বিভাগসহ গল্প বিভাগও বেশ সুন্দর হয়েছে। মঞ্জীর ঘোষের রম্য রচনা যেমন চিন্তার খোরাক যুগিয়েছে তেমনি ড. দেবদাস মণ্ডলের 'মহাভারতের কনিক-নীতি' এবং ড. গৌতম ভট্টাচার্য্যের চিনের ওপর বিশ্লেষণ ধর্মীলেখা দুটি পড়ে সমৃদ্ধ হয়েছি ও আনন্দ পেয়েছি। এই রকম যুগ সন্ধিক্ষণে 'নিবেদন'-র মতো একটি সুন্দর পত্রিকা প্রকাশ করার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই।

জে সাহা, ২৪ পরগনা (উ.)

'নিবেদন' পত্রিকার ড. গৌতম ভট্টাচার্য্যের চিনের ওপর লেখা প্রবন্ধ খুবই ভালো লাগল। আশা রাখি এরকম লেখা আপনাদের পত্রিকায় আরও পাব।

প্রণয় দত্ত
ফকির পাড়া রোড, বেহালা

'নিবেদন' পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা পড়লাম, পত্রিকাটির কবিতাগুলি হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। আমাকে গল্পগুলিও ভীষণভাবে স্পর্শ করেছে। প্রবন্ধটিও খুবই উচ্চাঙ্গের ও সুখপাঠ্য হয়েছে। বেহালার মতো শহরতলি থেকে এরকম প্রকাশনাকে সাধুবাদ জানাই। পত্রিকার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

মেঘমালা গরাই
বেহালা, বড়িশা, কলকাতা

আমি একজন উৎসাহী পাঠক, থাকি হিন্দমোটরের মতো একটি ক্ষয়িষ্ণু শিল্পাঞ্চলে। এখান থেকেও কিছু লিটল ম্যাগাজিন বেরোয়, কিন্তু তা নিয়মিত নয়-তাই বলছি 'নিবেদন' যেন হারিয়ে না-যায়। দ্বিতীয় সংখ্যার লেখাগুলো পড়ে খুব ভালো লাগল। তবে সমসাময়িক সময়ের ওপর মূল্যায়নধর্মী লেখার প্রত্যাশা রইল 'নিবেদন'-এর কাছে। অনেক শুভকামনা ও শ্রদ্ধাসহ

জয়জিৎ মৈত্র
বজ বজ, ২৪ পরগনা (দ.)

বর্তমান সময়ে ইলেকট্রনিকস মিডিয়াগুলি যেভাবে পাঠক টানছে অদূর ভবিষ্যতে প্রিন্ট মিডিয়ার প্রয়োজনীয়তা হারিয়ে যাবে কিনা জানা নেই। তবে একথা সত্যি যে, বর্তমানে মানুষের পড়ার অভ্যাস অনেক কমে গেলেও বহু পাঠকের কাছে পত্রপত্রিকার গুরুত্ব আজও কমেনি, আপনাদের কাগজের দুটি সংখ্যাই পড়ার সুযোগ পেয়েছি। ভালো লেগেছে। 'নিবেদন' আরও ভালো হোক এই প্রত্যাশায় এই চিঠি।

নমস্কার সহ

ইরিনা সাঁফুই
ক্যানিং, ২৪ পরগনা (দ.)

এক বন্ধুর মাধ্যমে 'নিবেদন' পত্রিকা পড়ার সুযোগ হল। নবীন পত্রিকা হলেও সুন্দর মুদ্রণ হয়েছে। মুদ্রণ প্রমাদ নেই বললেই চলে। অনেকের লেখা ভালো লেগেছে। আলাদা করে নামোল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করলাম না। আপনাদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যসাধনা এগিয়ে যাক- এই প্রার্থনা রইল।

নির্মাল্য আদক
তারকেশ্বর, হুগলি

'নিবেদন' পত্রিকার ১ম ও ২য় সংখ্যা দুটো পেয়েই পড়ে ফেললাম, সূচিপত্র, বিষয়বস্তুর বিচিত্রতার কথা বলে দিল, কবিতা, ভ্রমণ, পর্যালোচনা, ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা, গল্পকথা সবই। নতুন সাহিত্য-প্রয়াসী হলেও আত্মমগ্নতা রয়েছে, চেষ্টিত, প্রাণিত আর প্রয়াসে স্পষ্ট। নেই কোন উদ্বেল উচ্ছ্বাস, সোচ্চার ঘোষণা। সাধ্য সীমার মধ্যেই প্রস্ফুটিত, মুকুলিত। পাঠক হিসেবে সাধুবাদ কিছুতেই বাদ দেওয়া যায় না।

পত্রিকাটির কাছে এইরকম আরও নিবেদনের চিরপ্রত্যাশায় রইলাম অধীর আগ্রহে, ভবিষ্যতেও।

বুদ্ধদেব কুণ্ডু
কবিরাজ লেন, শিবপুর,

'নিবেদন' পত্রিকার দুটো সংখ্যাই একনাগাড়ে পড়লাম। এক ব্যতিক্রমী লিট্‌ল ম্যাগাজিন।

মন ভরে গেল লেখাগুলো পড়ে। আপনাদের পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি—

গৌতম নাগ
পাতুলিয়া, ২৪ পরগনা (উ.)

দুটো সংখ্যাই এক কথায় খুব মনোগ্রাহী। আঙ্গিকে, সাহিত্যরচনায়, চয়ণে ও প্রকাশে। পত্রিকার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

কণিকা রায়
দুইল্যা, হাওড়া